'কবিতা' সংকলন ১

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন,
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ,
অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়
হেমচন্দ্র বাগচী

আশ্বিন

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

সংকলন ১

মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

উৎসর্গ

প্রতিভা বসুর জন্য

মধুসূদন কি রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, এবং তাঁদের প্রতিভার বিকাশ কোনো একটি পত্রিকাকে আশ্রয় করে হয় নি। এমনটি কিন্তু ঘটেনি পরবর্তী বাঙালি কবিদের বেলায়। পঁচিশ বছর ধরে বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' পত্রিকা ছিলো বাংলা কবিতায় যা কিছু নতুন, যা কিছু গতিমান, সজীব ও উৎকৃষ্ট তার আয়না। একদিকে যেমন 'কবিতা'য় সে-যুগের প্রতিষ্ঠিতদের, যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, কবিতা ছাপা হয়েছে, তেমনি যাঁরা প্রতিশ্রুতিময় বা কেবল সম্ভাবনামাত্র—তাঁদেরও উত্থান এই পত্রিকাকে বাহন ক'রেই হয়েছে।

তাই এ-কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে 'কবিতা'র মতো কিছু আর হয় নি। পঁচিশ বছর ধ'রে নিয়মিত, নির্ভুল, নিরপেক্ষ ও অমোঘ যে কাজ 'কবিতা'র সম্পাদক ক'রে গেছেন তা সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে একটি চূড়াবিশেষ, একটি মেরু। পত্রিকার এমন এক মান 'কবিতা' স্থাপন করেছে যে পরবর্তী সমস্ত পত্রিকা, আভাঁগার্দ কি লিট্‌ল ম্যাগাজিন কি বড়ো ব্যবসায়িক পত্রিকা—সবেরই বিচার হবে 'কবিতা' পত্রিকার নিকষে।

পত্রিকা তো শুধু দুই মলাটের মধ্যে বিচ্ছিন্ন কিছু রচনার সমাবেশ নয়। পত্রিকা মানে একটি আন্দোলন, একটি গোষ্ঠি, একটি সংস্কৃতি। কোনো কোনো পত্রিকা হয়ে গেছে খুব বেশি পরিমাণে গোষ্ঠি-কেন্দ্রিক, কোনোটা রাজনৈতিক শিবির, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় নির্দিষ্ট বিশ্বাসের অভাব। কখনো বাণিজ্যই লক্ষ্য। বুদ্ধদেব বসু আশ্চর্যভাবে রাজনৈতিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিলেন। কবিতার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেই সংস্কৃতির মূল বিশ্বাস ছিলো ভাষার বিশুদ্ধতা। সাহিত্যের নিজস্ব মূল্য আছে, তা রাজনীতির সেবক, ধর্মের দাস বা দেশহিতৈষণার বাহক নয়। সাহিত্যের প্রতি এই নিষ্ঠা, এই নিবেদন তিনি 'কবিতা'র লেখক ও পাঠক মহলে, সংক্রমিত করতে পেরেছিলেন যেজন্য অনেকে '২০২-কালচার' ব'লে একটা বিশিষ্ট কৃষ্টির উল্লেখ করেন, কখনো প্রশংসার্থে, কখনো ব্যঙ্গার্থে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-র বাড়ি, যা ছিলো তাঁর পত্রিকার দপ্তর, সত্যিই ছিলো একটা ইশকুল, শুধু কবিতার ইশকুল নয়, জীবনযাত্রাপদ্ধতি, উচ্চারণ, হাতের লেখা, বানান, চিঠির পাঠের। আর তার সঙ্গে আড্ডা। 'কবিতা' পত্রিকার আড্ডাও অন্য পত্রিকার আড্ডার মতো ছিলো

না। অধিকাংশ পত্রিকার আড্ডাই বসে সেই কাগজের অফিসে, এবং তা পুরুষ-কেন্দ্রিক। কিন্তু 'কবিতা'র আড্ডায় ছিলো নারী ও পুরুষের সহজ মেলামেশা, বাংলা ও বিদেশী সাহিত্যের আনাগোনা, সুদৃশ্য পেয়ালায় সুগন্ধী চা (যা আসতো সুবোধ ব্রাদার্স থেকে)। অনেক রাত অবধি চলতো ওই আড্ডা। বিখ্যাত ছিলো বুদ্ধদেব বসু-র উঁচু-হাসি। 'অনেক রাত্রে আড্ডা ভাঙে কবিতা ভবনে···' যেমন লিখেছেন অরুণকুমার সরকার তাঁর কবিতায়।

'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশে যে যত্ন, যে নিষ্ঠা বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তা অনন্য। তিনি তাঁর সমসাময়িক প্রত্যেক কবির উপর লিখেছেন, এতো মনোযোগ ও সময় দিয়েছেন উত্তরসূরীদের, এতো নিরপেক্ষ হয়ে সমালোচনা করেছেন সমসাময়িক কবিদের যার দৃষ্টান্ত বিরল। 'কবিতা'র যে একশোটি সংখ্যা বেরিয়েছে তা পড়লে পাঠক সে-যুগের বাংলা সাহিত্য তো বটেই, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাও বুঝতে পারবেন।

'কবিতা'র প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৩৫ সালের আশ্বিন মাসে। আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়—বছরে এই চারটি সংখ্যা বেরুতো। কোনো কোনো বছরে পাঁচটিও বেরিয়েছে (বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক ১৯৪৭), শততম সংখ্যাটি বেরিয়েছে ইংরিজি ও বাংলায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রর নাম আছে, সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন। তারপর থেকে সম্পাদক শুধুই বুদ্ধদেব বসু। প্রথম বছরে বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ছয় আনা। প্রথম সংখ্যায় সোনালি-হলুদ প্রচ্ছদে কিউবিস্ট ছাঁদে 'কবিতা' পত্রিকার নাম লেখা। কবিরা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বাগচী। সংখ্যা শুরু হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র-র "তামাশা" কবিতা দিয়ে। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি যে সচেতন তা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় সংখ্যা শুরু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "ছুটি" কবিতা দিয়ে। প্রথম বছরে জীবনানন্দ-র "মৃত্যুর আগে", "বনলতা সেন", "হায় চিল", "হাওয়ার রাত" সহ দশটি কবিতা, সমর সেনের ষোলোটি। কবিতার একেবারেই নিয়ম-ভাঙা প্রকাশ। কোনো কোনো সংখ্যায় পাতার পর পাতা একই কবির কবিতা দেখতে পাই। এটা আর কোনো পত্রিকায় হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই।

'কবিতা'র কাগজ ছিলো ভারি, পুরু এ্যান্টিক, সূক্ষ্ম ঢেউ তোলা। ছাপা এতো

সুন্দর যে এখনকার অফসেট ম্লান মনে হয়। প্রথম আট বছরের পত্রিকা ছাপা হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের রংমশাল প্রেস ও মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেসে।

'কবিতা' পত্রিকার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ লেখাই বুদ্ধদেব বসু-র। সাহিত্যের যে কোনো বিশেষ ঘটনা নিয়ে (হোক তা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, হোক জি কে চেস্টারটন বা জেরম কে জেরম বা টি এস এলিয়টের নতুন বই-এর প্রকাশ) স্বনামে, বেনামে এবং অনামে বুদ্ধদেব লিখেছেন। আর লিখেছেন প্রতিটি প্রধান বাঙালি কবির কবিতার সমালোচনা। কবিদের যে-সব বৈশিষ্ট্য তিনি চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন তা এখন অনেকে না জেনে প্রায় প্রবাদের মতো ব্যবহার করেন। যেমন 'নির্জনতম কবি জীবনানন্দ'। "আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙাগড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেন নি।"

জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ বিখ্যাত কবিতাই ছাপা হয়েছে 'কবিতা'য়। সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুরও তাই। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'কবিতা'রই কবি। তাঁদের প্রচার ও খ্যাতি 'কবিতা'র মাধ্যমেই হয়েছে। 'কবিতা ভবন' থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের বই, বিজ্ঞাপিত, আলোচিত হয়েছে 'কবিতা'র পাতায়।

এই খণ্ডটি প্রথম আট বছরের সংকলন। বলাই বাহুল্য অনেক উৎকৃষ্ট রচনা বাদ দিতে হয়েছে। অনেক কবি 'কবিতা'র বাগানের যাঁরা বিশেষ কুসুম, এবং যাঁদের কথা বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আমাদের কবিতা ভবনে' লিখেছেন, এখানে বাদ গেছেন—যেমন স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় (সুরেন্দ্র মৈত্র) বা দ্বিজেন্দ্র মৈত্র। 'কবিতা' পত্রিকার চরিত্র বোঝার জন্য তার চেয়েও যেটা বেশি বাধা হয়ে উঠতে পারে তা হচ্ছে বুদ্ধদেব বসু-র অনেক অস্বাক্ষরিত গদ্যের বর্জন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর নিয়মিত সমালোচনা আছে প্রতি সংখ্যায়, নিতে পারিনি। বাদ পড়েছে 'কবিতা' পত্রিকার বিজ্ঞাপন, যেমন প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার শুরুতেই বিজ্ঞাপন 'শ্রেষ্ঠ উপহার' :

"নববর্ষে ও পূজায়, জন্মদিনে ও বিবাহে ও আরো কতো মধুর ব্যক্তিগত উপলক্ষ্যে প্রিয়জনদের মধ্যে উপহারের আদান প্রদান প্রচলিত। কী উপহার কিনবেন এই ভাবনায় আপনি কতবারই না উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন! আপনি বোধ হয়

কখনো ভেবে দেখেন নি যে বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার—এবং সবচেয়ে সস্তাও বটে। মাত্র দেড় টাকা খরচ ক'রে আপনার প্রিয়জনকে এক বছরের 'কবিতা' উপহার দিলে আপনি যেমন তৃপ্তি পাবেন ও তিনি যেমন খুসি হবেন তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্র হলেও বছরের শেষে একসঙ্গে বাঁধালে আধুনিক কবিতার একটি চমৎকার চয়নিকা হয়ে দাঁড়াবে। সে-বই হবে রাখবার মতো, পড়বার মতো, বার-বার পড়বার মতো। ভালো কবিতা প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ উপহার, সেই উপহারই আপনি দিন। আগামী ১লা আশ্বিন 'কবিতা'র দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হবে, আপনার আদেশ পেলেই আপনার বন্ধুকে আমরা গ্রাহক ক'রে নেবো; বন্ধুর আনন্দে সার্থক হবে আপনার উপহার।"

বিজ্ঞাপন বাদ দেয়াটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা ভীষণ অভাব। 'শ্যামবাজার স্টোর্সে'র (১৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা) বিজ্ঞাপনে থাকতো জনৈক অনামা নীরব কবির এই রচনাটি :

"মনের অন্তরাকাশে রূপ সজ্জায়
যেমন কবিতা—
বাহিরাকাশের রূপ সজ্জায়
তেমন প্রসাধন সামগ্রী।"

বিস্ময়কর যে এঁরা নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন। তেমনি দিতেন 'জাইস পুংটাল' "চশমার জন্য বিশ্ববিশ্রুত, এডেয়ার ডট এ্যাণ্ড কোং লি."। রেল ও ওটিন স্নো-র বিজ্ঞাপন ছিলো দারুণ মজার। ক্যাডবেরি বোর্নভিটায় একেকবার একেক-জনের ছবি দেয়া হতো। দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় আছে সাধনা বোসের ছবি, তাঁর সই-এর তলায় ব্র্যাকেটে লেখা মিসেস মধু বোস। বই-এর বিজ্ঞাপন তো আছেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সমর সেন—সকলের বই-এর বিনি পয়সার বিজ্ঞাপন, প্রচারের জন্য। ডি. এম. লাইব্রেরি যখন প্রথম প্রকাশ করলো 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' জীবনানন্দর, তার বিজ্ঞাপন স্পষ্টতই বুদ্ধদেবের লেখা : "সব মিলিয়ে এই অত্যন্ত সজীব ও পরিণতিশীল কবির ক্রম-বিকাশের একটি সম্পূর্ণ স্তর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে পাওয়া যাবে···।" বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি অনেক অতিপরিচিত বিখ্যাত কবিতা যা এখন সব সংকলনে আছে, যেমন "আট বছর আগের একদিন"। এটা আশ্চর্য যে যে-সব কবিতা আমরা আজকাল চিরায়ত মনে করি তার অধিকাংশ ছাপা হয়েছে 'কবিতা'য়। আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেক কবির প্রথম বেরুনো কবিতা নিতে, এবং অতি-উদ্ধৃত

কবিতাগুলিও নিয়েছি এটা দেখাতে যে সে-সব 'কবিতা'তেই ছাপা হয়েছে। নিতে পারিনি বুদ্ধদেবের অনেক রিভিউ যা সেই আনন্দ বহন করে আনে যা প্রথম বৃষ্টির, তাজা একটা অনুভূতি। বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা শিক্ষিত, অনুভূতিশীল মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন উৎসাহ।

এটা খুবই আশ্চর্য যে নিজে একজন প্রধান কবি হয়ে কী ক'রে অন্যান্য কবি-দের বিষয়ে এই উৎসাহ, এই ভালোবাসা, এই মনোযোগ বুদ্ধদেব দিতে পারতেন, ভূমিকা নিতেন তাঁদের প্রচারকের। তার সবটুকু পরিচয় আমরা দিতে পারলাম না, এই অনুশোচনা।

বানান ও কবিদের নাম যেমন ছাপা হয়েছে তেমন রাখা হয়েছে। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথমে লিখতেন সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং নরেশ গুহ নরেশচন্দ্র গুহবক্সী। যেভাবে তাঁদের নাম ছাপা হয়েছিলো তাই রেখেছি।

এই সংকলন করার কথা প্রথমে নিরুপম চট্টোপাধ্যায় ও আমি ভেবেছিলাম। বছর সাতেক আগে প্রাথমিক কাজও আমরা একসঙ্গে করেছিলাম এবং জনৈক প্রকাশকের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। কোনো কারণে সে বই প্রকাশিত হয় নি। এবারে এই সংকলন যে প্রকাশিত হতে পারলো তার কৃতিত্ব শ্রীস্বপন মজুমদারের। তাঁর আগ্রহ ও পরামর্শ আমার কাছে অমূল্য হয়েছে।

'কবিতা' পত্রিকার কয়েকটি বছরের সম্পূর্ণ সেট আমাদের ছিলো না। ন্যাশনাল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ ড. অশীন দাশগুপ্তের সহায়তায় সেই সংখ্যাগুলি জিরক্স করতে পেরেছি লাইব্রেরির নিজস্ব সংগ্রহ থেকে। তাঁরা নিজেরাই জিরক্স করে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ 'কলকাতা ২০০০' পত্রিকার পীযূষকান্তি নন্দীর প্রতিও—যিনি বাকি কপিগুলি জিরক্স করিয়ে এনে দিয়েছিলেন। এবং কৃতজ্ঞ 'প্যাপিরাস'-এর কাছে অতি দ্রুত বইটি বের করার জন্য। আর রান্নায় যেমন নুন, অদৃশ্য, তেমনি আমার সব কাজেই যিনি থাকেন, এ-ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন, জ্যোতির্ময় দত্ত।

মীনাক্ষী দত্ত

সূচি

প্রথম বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষ

পঞ্চম বর্ষ

ষষ্ঠ বর্ষ

সপ্তম বর্ষ

অষ্টম বর্ষ

চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে' বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ;

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইষ্টিশানে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চলে' গেলো।—কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন করে' বলি।

আকাশে সূর্য্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত !
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রূপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝরে' পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্য্যের চুম্বনে।—এখানে জ্বলে' উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে

জলের উপর দিয়ে।—কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো।

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। ছাখো, ছাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন করে' বলি।

সমর সেন

Amor stands upon you.

Ezra Pound

তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।

আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?
তুমি যেখানেই যাও—
আকাশের মহাশূন্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।

সমর সেন

স্মৃতি

আমার রক্তে খালি তোমার স্বর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম,

পার হ'য়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্ত্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পাব হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত্ত,
শ্রান্ত হ'য়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নীলিমাকে

বাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগব
অন্ধকাবের সাগর—
তুমি তাতে স্নান কবে' এসো, নীলিমা,
তোমাব চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলেব মঞ্জবীব মতো।
আব যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে' ওঠে চাঁদ
তোমাব আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমাব বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নাব গন্ধ :
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে, নীলিমা,
নীল পাখিব পালকের মতো ?
জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা কয়ে' উঠলো—
আর মেঘেব গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা ?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

হেমচন্দ্র বাগচী

সমাপ্তির সুর

বড় ভালোবেসেছিনু, হে ধরণী, তোর মায়ালোক
তোর মুগ্ধ প্রেমচ্ছবি, হাসিভরা পরিচিত চোখ
বড় ভালো লেগেছিল ; বিষণ্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে
চিত্ত মোর পূর্ণ হ'লো অব্যক্ত গভীর হাহাকারে
অতিদূর বেদনার লাগি' । এ জীবনে বহুবার
আত্মার অতল তলে শুধায়েছি প্রিয়েরে আমার
'আমার গভীর প্রেম সে কি সত্য নয় ?'
শুনিয়াছি
জীবন-সাগর-তটে অনন্ত মৃত্যুর কাছাকাছি
প্রশ্নের উত্তর মোর—শুনিয়াছি প্রেম মৃত্যুহীন
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে সে প্রেমের কে শুধিবে ঋণ ?
দেখিয়াছি কতদিন এ নীরব অন্তরের মাঝে
সীমাতীত রূপলোক বেদনার অপরূপ সাজে ।
সেথা বসি' ধ্যানাসনে শুধায়েছি প্রিয়েরে আমার—
কহ তুমি সত্য করি' মোর প্রেম অনন্ত অপার
সে কি শুধু গৃহকোণে মধ্যাহ্নের কপোত-গুঞ্জন ?
সে কি শুধু রাগারুণ চুম্বনের অলস ভুঞ্জন ?
আমি ত করেছি পান যৌবনের তপ্ত দ্রাক্ষারস,
পীতশেষ পাত্র মোর পান করো ব্যাকুল বিবশ—
যদি তাহে কোনোদিন অন্ধকার শর্ব্বরীর শেষে
মোর নাম, হাসি মোর, মোর দৃষ্টি উঠে যদি ভেসে
সেদিন চিনিবে মোরে তরল অশ্রুর বরষণে,
সেদিন কবিরে তব ক্ষণে-ক্ষণে পড়িবে যে মনে
কদম্ব-কেশর-ঝরা বরষার বনপথ-পারে ।
সেইদিন প্রেম তব মহেন্দ্রের তোরণের দ্বারে
লিখিবে লিখন তার ইন্দ্রানীর কপোল ঘেরিয়া
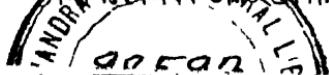
নামিবে অশ্রুর বাষ্প, ভাবিবে সে উদাসিনী হিয়া
কত সে উদার প্রেম—ধরণীর মুগ্ধ শিশু প্রাণ
তার মনে কোথা হ'তে এল দূর সমুদ্রের গান
অসীম স্থন্দর!
এমনি ভাবিনু কত কাল রাতে
অন্ধকার মানসলোকের প্রান্ত হ'তে; যে-আঘাতে
আকাশের বক্ষ চিরি' বাহিরায় বিদ্যুৎ-রুধির
যে-আঘাতে উদ্বেলিত বক্ষতল শ্যামা ধরণীর
তেমনি আঘাত লেগে ফুটে মোর মানস কুসুম
অতি দূর স্বর্গ-অভিলাষী। তাই চক্ষে নাই ঘুম,
সহিতে পারে না তাই রাত্রি মোর বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শঙ্কার শিহরে কভু, কভু হয় উতলা উদাস
বেদনায় বিবর্ণ মলিন। তাই মোর প্রাণ ধায়
বহু দূর সিন্ধুপারে অজ্ঞাত নদীর কিনারায়,
যেখানে গাহে না পাখী, প্রভাতের আলো নাহি আসে,
শুধু উঠে চিতাধূম, শ্মশানের শবগুলি ভাসে
সিন্ধু-শকুনের দল উড়ে যায় দিগন্তের পারে—
সূর্য্যের চিতার পানে ছায়াম্লান বনের ওপারে।
সেথা কারা গাহে গান অদৃশ্য সে ছায়া-শরীরিণী,
মোর মনে জাগে শুধু ব্যথাময়ী কাল-প্রবাহিনী
প্রচণ্ড আবর্ত্তে তার চেয়ে আছি—পড়ে না নিমেষ।
প্রেম—সেকি সত্য নয়? এবারের মত সবি শেষ?

কবিতায় দুর্বোধ্যতা

ভালো কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, পেশাদার সমালোচক প্রকাশকের বিজ্ঞাপন-লেখক, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন সময়ে বহু বিভিন্ন

উক্তি করেছেন ; কিন্তু পাঠকের বোধগম্যতার উপর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে, এমন কথা কখনো বোধ হয় শোনা যায়নি। কবিতা সম্বন্ধে যত উদ্ভট ও অনর্থক কথা এ-পর্য্যন্ত বলা হয়েছে, পৃথিবীর আর-কোনো বিষয়ে সে-রকম হয়েছে কিনা জানিনে ; তবু কাব্যজিজ্ঞাসুদের সমর্থনে এ-কথা অন্তত বলা হোক্ যে সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবে পড়ে' বুঝতে না-পারলেই কবিতা হ'লো না—কিম্বা, ভালো কবিতা তা-ই, সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়ে'ই যা বুঝতে পারে—এমন স্থূল মূঢ়তা কোনো অধ্যাপকের উচ্চ আসন থেকেও কখনো ধ্বনিত হয়নি। বস্তুত, কবির সঙ্গে তাঁর পাঠকের সম্বন্ধ কাব্যজিজ্ঞাসার অংশ হিসেবে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি—অন্তত, অত্যাধুনিক মনোবিশ্লেষণী যুগের আগে পর্য্যন্ত হয়নি। স্বয়ং কবিরা সম্ভবত পাঠক-সম্বন্ধে চির-কালই মনে-মনে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে' এসেছেন—সে-অবজ্ঞা যদি পাঠকের গ্রহগুণে কখনও সরূপ হয়, তাহ'লেই বেশি। ল্যাণ্ডরের উদ্ধত গর্বের ভাব সকল কবির মধ্যে স্পষ্ট উচ্চারিত না হলেও, ঔদ্ধত্যটুকু বাদ দিয়ে কবির মনের কথা সেটাই। তার প্রকাশ আছে মিলটনে, আছে ভবভূতির বিখ্যাত ও অতি-উদ্ধৃতিতে প্রায়-অসারীকৃত শ্লোকে, আছে আমাদের রবীন্দ্রনাথে, যে-কোনো মহৎ কবির রচনা থেকে একটু কল্পনা প্রয়োগ করলে এ-মনোভাব উদ্ধার করা শক্ত নয়। আমার যা বলবার তা তো আমি বলে' গেলাম, এখন তোমরা পড়ো আর না-ই পড়ো, বোঝো আর না-ই বোঝো : ভাবটা অনেকটা এইরকমের।

অথচ কবি যখন তার রচনা বাক্সে বন্ধ করে' কি তার প্রচার দু' চারটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না, তাঁর রচনা যখন প্রকাশিতই হয়, এবং কাগজের উপর যারা কলম চালায়—কবি হোক্, অকবি হোক্, সকলেরই মনে যখন অস্বীকার্য্য যশোলিপ্সা আছে, তখন পাঠকের একটা দিক মানতে হয় বইকি। সকল পাঠকই মূঢ় নয় ; এবং ঘর্ম্মায়মান কবিনামলোভীর চাইতে (এ-শ্রেণীটা সব দেশে সব সময়েই অনিবার্য্য) একজন বুদ্ধিমান ও রসজ্ঞ পাঠকের সামাজিক মূল্য অনেক বেশি। পাঠকের বোধগম্য হওয়া কবিতার কর্তব্য নয় : কিন্তু এটা দেখা যে যথার্থ কবিতা—যত বিচিত্র রীতি ও প্রকৃতিরই হোক্ না—যথার্থ রসজ্ঞের মর্মস্পর্শ করতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়নি—অবিশ্যি নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির খাতির কিছু গলতি ধরতেই হবে।

শেষ পর্য্যন্ত হয়নি, বললাম : কেননা কিছুকালের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে, এ-উদাহরণের জগতে অভাব নেই। চলতি ফ্যাসানের রঙ আমাদের বুদ্ধিতে রুচিতে রসবোধে এমন পাকা হ'য়ে লাগবে যে তা কাটিয়ে উঠে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বধর্ম্মী নতুন কবিকে গ্রহণ করতে অসাধারণ মনই পারে—এবং নামেই প্রকাশ, অসাধারণত্ব

বিরল। পাঠকের সঙ্গে কবির এ-সংঘাত ঘটেছে প্রতি যুগে দেশে-দেশে। কিন্তু এই নজিরের জোরে উৎকট উন্মত্ততাও কখনো-কখনো কবিতা হবার হাস্যকর দাবি করেছে, আজকালকার দিনে বিশেষ করে' এ-দৃষ্টান্তের অভাব বোধ হয় নেই। কেননা উন্মত্ততা প্রতিভার মতই অ-সাধারণ, এ-দুয়ে ভেদরেখাও সব সময় স্পষ্ট-নির্ণীত নয়; এবং প্রতিভাবানকে উন্মাদ কি উন্মাদকে প্রতিভাবান বলে' ভুল করা সব সময়েই সম্ভব। এখন, এমন যদি কোনো নতুন কবি আসেন, যাঁর রচনা আমরা 'বুঝতে' পারছি না, সেটা কি আমাদের মূঢ়তার প্রমাণ, না কবির নগণ্যতার?

প্রকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে, অবিশ্যি, এ-সমস্যার মীমাংসা করেছে সময়। আমরা জানি, অনেক মুখ্য কবির প্রথম আবির্ভাব সমসাময়িক ব্যঙ্গে ও লাঞ্ছনায় কণ্টকিত; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মহত্ত্বের উপলব্ধি মৃত্যুর পূর্ব্বে ছাড়া হয়নি। বাধা হয়েছে অবিশ্যি সমসাময়িক রুচির দৌবাস্থ্য, যার সঙ্গে কবির স্বকীয়তা মেলেনি। চলতি সাহিত্যিক ফ্যাসানে শাসিত, আমরা নব প্রতিভাকে 'বুঝতে' পারিনে; বলে' ফেলি —এর মানে হয় না।

এখন বলতে গেলে, কবিতা সম্বন্ধে 'বোঝা' কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা বুঝিনে'; কবিতা আমরা অনুভব করি। কবিতা আমাদের কিছু 'বোঝায়' না; স্পর্শ করে, স্থাপন করে একটা সংযোগ। ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না, 'বোঝানো' যাবে না। যে-কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায় তার উচ্চতম রূপ আঠারো শতকের ইংরিজি কবিতা: তাতে আর সবই আছে, কবিতা নেই। যে-কবিতা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে নিতান্তই বোঝা গেলো, সে-কবিতা লংফেলো মিসেস হেমান্সদের, ইস্কুলের পাঠ্যকেতাব তার পরম গৌরবময় কবর। যা 'বোঝবার' জিনিষ, বোঝাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফুরিয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-অতীত বুদ্ধি-পলাতক যে-বিরাট উদ্বৃত্ত, যে-জ্বলন্ত ভাবমণ্ডল—যেখানে অপরূপ ধ্বনির আর অলৌকিক ইঙ্গিতের সীমাহীনতা—কবিতা তো তা-ই, তা ছাড়া আর কী? সেটা 'বোঝা' যায় না. 'বোঝানো' যায় না; যে নিজে না ছাখে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায় না তাকে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বর্ণিতঈশ্বর-উপলব্ধির মত এ-উপলব্ধিও অসংবেদনীয়।

সুতরাং এটা মোটেও আশ্চর্য্য নয় যে, পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রথমটায় দুর্বোধ্য কি অর্থহীন বলে' তিরস্কৃত হবে। আশ্চর্য্য যেটা, সেটা এই যে দুর্বোধ-অভিহিত কবিতা প্রায় ক্ষেত্রেই নিতান্ত সহজ ভাষায় সহজ রীতি; এবং অন্যপক্ষে, কঠিন শব্দ বিন্যাসে অলঙ্কার-জটিল কবিতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অপবাদ বড় শোনা

যায় না। মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়তে শিক্ষিত লোককেও একাধিকবার অভিধান খুলতে হয় ; কিন্তু এ-কথা কেউ বলে না যে ও-কাব্য বোঝা যায় না। গীতাঞ্জলিতে এমন কথা প্রায় নেই যা আমরা আমাদের প্রতিদিনকার আলাপে ব্যবহার করিনে, কিন্তু গীতাঞ্জলি যে হেঁয়ালি এ-কুসংস্কার দেশে মরতে-মরতেও এখনো টিঁকে আছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের শত্রুদলের প্রধান প্রতিপাদ্যই ছিল এই যে তাঁর কবিতার 'মানে হয় না' ; এবং এই ধারণা তৎকালীন পাঠকদের প্রচুর করতালিও পেয়েছিলো। এই সমালোচকদের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন, ছিলেন রসগ্রাহী, কিন্তু তাঁদের চৈতন্য আচ্ছন্ন ছিলো সেই কাব্যাদর্শে, যাতে তখন পর্য্যন্ত বাঙলা কবিতা রচিত হতো। তাঁদের মনে ছিলো মহাকাব্যের মহিমা, তাঁদের মনে বাজতো নব রসের কনসার্ট, বাজতো নিছক ছন্দের, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার, ওস্তাদ কারিগরিকে তাঁরা কবিত্বশক্তির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন করে' দেখতেন। ভারতচন্দ্রের সমস্ত জটিল মারপ্যাঁচ, তাই, অতি সহজবোধ্য , মধুসূদনের দীর্ঘ বিজড়িত বাক্য-বিন্যাসে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই ; দুর্বোধ্য কেবল সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ত্ততাই অর্থহীন। তা তো হ'তেই হবে ; কেননা কবিতার কঠিন শব্দ-চয়ন ও জটিল বাক্য-বিন্যাসেই তাঁরা অভ্যস্ত ; সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই সঙ্গত, সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ততাই অপ্রাকৃত বিকৃতি।

কিন্তু হয়-তো সমসাময়িক রুচির কথাই কেবল নয়। গীতাঞ্জলি যে-শ্রেণীর রচনা, যা বলা যায় বিশুদ্ধ কবিতা, যেখানে কথাগুলো রূপক-চিহ্ন মাত্র, পরস্পর-যোজনায় উজ্জ্বল সেতু রচনা করে পাঠকে ও কল্পনার অনির্দ্দেশ্য অপরিসীম তীরপ্রান্তে ; এ ধরণের কবিতা অধিকাংশ পাঠকের মধ্যে সমাদৃত (ফ্যাসানের খাতিরে ছাড়া) হ'তেই পারে না। কবিতা লিখতে হ'লে যেমন বিশেষ একটি ক্ষমতা নিয়ে জন্মাতে হয়, বিশুদ্ধ কবিতা উপভোগ করতে হ'লেও তেমনি একটী জন্ম-গত ক্ষমতার প্রয়োজন। অধিকাংশ পাঠকই চায় যে কবিতা হবে স্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট, সঙ্কীর্ণ একটা বিষয়ে আবদ্ধ, যা ধরা-ছোঁয়া যায়, যা 'বোঝা' যায়—যেমন করে' ও মনের যে-বৃত্তির সাহায্যে আমরা বুঝি গণিত কি দার্শনিক প্রবন্ধ—অবিশ্যি তার সঙ্গে থাকবে ছন্দের সুখদ ঝঙ্কার। মানে, কবিতা গ্রাহ্য হয় কর্ণেন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। কিন্তু এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে কবিতা যত অল্প 'বোঝা' যাবে ততই তা উচ্চতর শ্রেণীর এবং বিশুদ্ধ কবিতায় বোঝাবুঝির কোনো বালাই-ই নেই। এমন যদি হয় যে কেউ জিজ্ঞেস করে 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কি 'Tiger! Tiger ! Burning Bright' কবিবার 'অর্থ' কী, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ এ-কথাই বলে' উঠতে হয় : 'অর্থ ! অর্থ আবার কী !' সত্যি-সত্যি ও ছাড়া কোনো উত্তর নেই।

অবিশ্যি অধ্যাপকদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করছি না : তাঁরা অধ্যাপক, তাঁরা সবই পারেন।

সমাজপতি প্রমুখ ধুরন্ধরদের অযথা অপবাদ দিয়ে লাভ নাই ; রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত কাব্যাদর্শ ও কাব্য-রীতির সঙ্গে তাঁদেব একেবারেই পরিচয় ছিলো না। কিন্তু ববীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন দেশে সর্ব্বব্যাপী, যখন পরবর্ত্তী কবিগোষ্ঠী তাঁরই ইস্কুলে প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন, মানে—ঠিক এই সময়েও বঙ্গ-কবিতার এই অপেক্ষাকৃত পরিণতির যুগেও—এমন পাঠকের নিশ্চয়ই অভাব নেই যার কাছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্য-রচনা 'অর্থহীন' ঠেকে ঠিক যেন 'বোঝা' যায় না, কেমন অস্পষ্ট ঠেকে, একটা হাতল পাওয়া যায় না যেটা আঁকড়ে কবিতাটাকে বাগানো যায়। বাংলাদেশে কবিতা যাঁরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে মনে-মনে—কি কখনো-কখনো প্রশংসনীয় প্রকাশ্যতায়—রবীন্দ্রনাথেব চাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ কি নজরুল ইসলামকে অনেক বেশি পছন্দ করেন। কেননা শেষোক্ত কবিদের বচনার একটা নির্দ্দিষ্ট 'বিষয়' আছে, তা স্পষ্ট ও স্পর্শসহ, তার বোধগম্যতা বুদ্ধিসাপেক্ষ। আমার বক্তব্যেব আর-একটা মস্ত প্রমাণ এই যে ববীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমাদেব দেশে কথা ও কাহিনীর প্রচাবই বহুলতম : কেননা সেখানে আছে সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়, আছে বোধগম্যতা।

কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে গীতাঞ্জলি শ্রেণীর রচনা কখনো 'কঠিন' বলে' আখ্যাত হয় না। অমন অপরূপ সরল বলে'ই সাধাবণ বোধশক্তিকে তা লঙ্ঘন করে' যায়। ভাল কবিতা কখনো-কখনো দুরূহ ও কঠিন হয়, হয় একাধিক কাবণে। মিলটনের মত পণ্ডিতের রচনায় এমন বহুল আনুষঙ্গিকতা থাকতে বাধ্য যে টীকা প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া সমস্তটা উদ্ধাব কবতে হ'লে মিলটনের মতই পণ্ডিত হ'তে হয়। তার-পব ব্রাউনিঙের দুরূহতার জন্যে দায়ী তাঁর অতি-ঘনীভূত বক্র রচনা-রীতি ; সেই রীতির মধ্যে একবাব প্রবেশ করতে পারলে ব্রাউনিঙের দুরূহতা অনেকাংশেই দূর হয় এটা প্রত্যক্ষ দেখা গেছে। ও-রকম না-লিখে ব্রাউনিঙের উপায় ছিলো না, ঐ রীতিটাই ব্রাউনিঙ। কিন্তু আর এক রকমের দুরূহতা হ'তে পারে যেটা ইচ্ছাকৃত ও মস্তিষ্কপ্রসূত। গোলকধাঁধার মত ঘোরেল একটা কৃত্রিম রীতি উদ্ভাবন করা যায়। আর-কোনো উপায় না থাকলে প্রশংসনীয়—কিন্তু কী নিষ্ফলা—শ্রম-দ্বারা এমন শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব, অভিধানেও যা পাওয়া যায় না। বলেছি, শ্রেষ্ঠ কবিতায় লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না ; কিন্তু যেটা বোঝা যাচ্ছে না সেটাই শ্রেষ্ঠ নয়। যথেষ্ট মাথা খাটিয়ে এমন কবিতা তৈরি করা সম্ভব, যা নিতান্ত দুরূহ,

এবং যার মধ্যে দুরূহতা ছাড়া আর-কিছুই নেই। দুরূহতার চেহারা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, এবং সেটা ভাঙ্গিয়ে কিছুকাল কবি-খ্যাতি উপভোগ করাও বিচিত্র নয়। ভালো কবিতা কখনোই 'বোঝা' যাবে না এ-কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা যেন এই কৃত্রিমের স্পর্দ্ধা সম্বন্ধে সতর্ক থাকি।

জীবনানন্দ দাশ

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে' আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে; বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল;
সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী,—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

চিঠি-পত্র

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু—

তোমাদের "কবিতা" পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে। অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থ-ভাবে তার মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন। বস্তুত সকলক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহসৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতো-জোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টি-বিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত। অথচ অন্যত্র এই ছদ্মনামা কবির লেখায় অবাধছন্দের কলাদক্ষতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তা বলে তাঁর এ কবিতাটি বর্জ্জনীয় নয়—আমি যা বলেছি সে আঙ্গিকের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে লেখাটির উপভোগ্যতা অস্বীকার করতে পারিনে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তামাসা" কবিতাটিতে পাহাড়তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে, অথচ সহজে নয়। বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, সেটা দুর্ব্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার

রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচম্‌কা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাট বাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইনবনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকলজির আকাঁড়া ইংরেজী শব্দ বাংলাকাব্যের জঠরে চালান করতে পারো কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্ত থেকেই যাবে। সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢতার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টঁ্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্চে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের "নীলিমাকে" কবিতাটি পূর্ব্বেই দেখেছিলেম এবং প্রশংসাও করেছি। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ—তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে—অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তার আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্দ্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তিস্বীকার উপেক্ষা করতে। এ সাহস ক্ষমতারই সাহস। এবারে তাঁর জন্মান্তর কবিতাটি বিশেষ ভালো লাগল। সুধীন্দ্রের কাব্যকে গাল দিয়েও সমালোচকেরা সম্মানিত করেনি এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে—এ ছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।

আমার কাছ থেকে কবিতা চেয়েচ। জাননা আমার কলমটাকে পিঁজরাপোলে পাঠাবার সময় এসেছে। অন্তর্য্যামী জানেন এখন না-লেখার চর্চ্চা করাই আমার চরম সাধনা। অনেকদিন লেখা চালিয়েছি এখন যদি পরের দাবীতে ও অভ্যাসের নেশায় লেখা না থামাতে পারি তাহলে অপঘাত ধ্রুব। এই যে তোমাকে দীর্ঘ চিঠিখানা লিখলুম এটা উজান ঠেলে। শরীর আমার নিরতিশয় ক্লান্ত, মন তাই কর্ম্মবিমুখ। তোমাদের তো সম্বল কম নেই দেখতে পাচ্চি—আমার কাছে প্রার্থনা করে লজ্জায় ফেলো না।

ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* বুদ্ধদেব বসুকে লেখা

অর্কেষ্ট্রা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীভবন, একটাকা বারো আনা।

কবিদের মধ্যে দুটো জাত আছে : যাঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন, আর যাঁরা ভেবে-চিন্তে লেখেন ; যাঁরা কবিতা লেখেন না-লিখে পারেন না বলে', আর যাঁরা লেখেন লিখতে হবে বলে'ই। কোনো কোনো কবি আছেন স্বভাবতই মাতাল, কোনো-কোনো কবি নিতান্তই প্রকৃতিস্থ। তীব্র আবেগই হচ্ছে প্রথম জাতের কবিদের চিরন্তন উৎস, দ্বিতীয় জাতের কবিরা বুদ্ধিনির্ভর। কবিতার এই দুটি ভাবে কখনো মেলা-মেশা না হয় এমন নয়, তবু এই আলাদা দুই জাত স্পষ্টই চেনা যায়। শেলি বার্ন্‌স্ রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাতের, মিল্‌টন রবার্ট ব্রিজেস মোহিতলাল দ্বিতীয় জাতের।

সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম জাতের না-বলে' বরঞ্চ দ্বিতীয় জাতের বলাই ভালো। স্বতঃস্ফূর্ত্ত গীতি-কবি হিসেবে বিচার করলে তাঁর সমূহ ক্ষতি। গীতিকবিতার সহজ ফুর্ত্তি নেই তাঁর রচনায়। মুহূর্ত্ত-মধুর, পলাতক ভাবগুলি হাঁপিয়ে ওঠে তাঁর 'ভালো লেখবার' প্রচেষ্টায়, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য, এমনকি উৎকৃষ্ট শব্দপ্রয়োগের চাপে। যে-অপূর্ব্ব মায়ার স্পর্শে অপ্রচলিত কি অপরিচিত শব্দ কবিতায় হঠাৎ প্রাণে উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে, দুঃখের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের সেটা আয়ত্তের বাইরে। ভাবের কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ করবার জন্য প্রশংসনীয় পরিশ্রমে অনেক শব্দ তিনি অভিধান থেকে কুড়িয়ে এনেছেন বটে, কিন্তু সেগুলো কিছু 'বলে' না।

তবে এটা যদি ধরে' নিই যে তিনি কবিতা লেখেন আত্ম-প্রকাশের অনিবার্য্য তাগিদে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা হিসেবে, তা'হলে তাঁর এই 'অর্কেষ্ট্রা' বইতে অনেক ভালো জিনিস আবিষ্কার করতে দেরি হয় না। তিনি কবি যতটা, তার চেয়ে কারি-গর ঢের বেশি ; এবং কারিগরিতে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের প্রমাণ 'অর্কেষ্ট্রা'র প্রতি পাতায়। তার মানে এ নয় অবিশ্যি যে তিনি কেবলই কারিগর।

'লক্ষ-লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর-আগ্রহ-ভরে বিতরিলো দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কার।'

'—তোমার উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্তস্পর্শে ধান্যসম কেলিপরায়ণ'

'নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ'

উদ্ধৃত পংক্তিগুলো যাঁর রচনা, তাঁর কবিত্বশক্তি অনস্বীকার্য্য। এ-সব স্থলে ছন্দের নিপুণ ঝঙ্কার কোনো বিশেষ একটি অনুভূতিকে ফুটিয়েছে, সে-অনুভূতি স্পর্শসহ,

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। মোহিতলালের 'বিস্মরণী'র প্রধান গুণ ছিলো এটি। এবং যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি সুধীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যে অঙ্গীকার করে'ই নিয়েছেন, সূক্ষ্মতরোরূপে মোহিতলালের প্রভাবও কম নয়। যে-ধরণের সাংস্কৃতিক বাক্যবিন্যাসে সুধীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই সচেষ্ট তা যে কতদূর জীবন্ত, বেগবান ও ধ্বনিকল্লোলিত হ'তে পারে মোহিতলালই তা দেখিয়েছেন 'বিস্মরণী'তে। তিনিও এনেছিলেন অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিলেন নিজের প্রতিভার জোরে।

ভাবের দিক থেকেও এ দুই কবিতে মিল আছে। উভয়েই দেহবিলাসী, ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক। এর ফল প্রেম সম্বন্ধে যে-মনোভাব সেটা স্বভাবতই অগভীর। কিন্তু মোহিতলালের রচনায় মানুষের কাম কুমারসম্ভব দেব-বাসনার স্তবে গিয়ে পৌঁচেছিলো, তার কারণ তাঁর বীর্য্যবান পৌরুষ। সে-তেজ নেই সুধীন্দ্রনাথে। তাঁর কাব্যের প্রেম একবারের বসন্ত-বন্যায় নিঃশেষিত; তাঁর নায়ক-নায়িকা স্বীকার করে'ই চপল। এ-ধরণের প্রেম ভালো কবিতার বিষয় হ'তে পারে, অনেকবারই হয়েছে। হেরিক্, সকলিঙ প্রভৃতি কবিতে এই বস্তুই আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'ও কি এই নিয়েই নয়! কিন্তু এই চপল প্রেমের প্রকাশও চপল হওয়া উচিত। এ-প্রেমের কথা বলতে গেলে হেরিকের মতই প্রজাপতি-পাখায় সঞ্চালিত হ'তে হয়, 'ক্ষণিকার' চাপা হাসির লীলাতেই এ-রস ভালো জমে। সুধীন্দ্রনাথের গম্ভীর ও জটিল রচনা-ভঙ্গির সঙ্গে এই ভঙ্গুর দেহনির্ভর প্রেমের একটা ঘোরতর অসঙ্গতি আছে। হালকা ক'রে বললে যে-কথাটায় মজা লাগতো, অমন গুরু-গম্ভীর স্বরে বলাতেই সেটা যেন ঠেকে ঈষৎ ডিকাডেন্ট, 'নব্বুই সন' গোছের। এটা আরো বুঝতে পারি এই কারণে যে এই কথাটাই তিনি 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার একটি গীতি-কবিতায় হালকা করে' বলেছেন ('খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম তোমার প্রেমে')—এবং সেখানে আমাদের উপভোগ কোথাও পীড়িত হয় না; সম্পূর্ণ, অকুণ্ঠ করে'ই ভালো লাগে।

সব দিক থেকে দেখতে গেলে, নাম-কবিতাটিই এ-বইয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। কবিতাটির সম্ভবত মস্ত উচ্চাশা ছিলো, সেটা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলতে পারিনে। একদিকে চলেছে সঙ্গীতের বর্ণনা; অন্যদিকে সেই সঙ্গীত যে-সব স্মৃতির ঢেউ তুলেছে কবির মনে, চলেছে তারই প্রকাশ লিরিকের পর লিরিকে। এবং সেই লিরিকগুলো মিলে যেন কথা-ছাড়া সঙ্গীতকে মূর্ত্তি দিতে চাইছে ভাষায়। এই আলাদা জিনিসগুলো সুধীন্দ্রনাথ নিপুণ শিল্পের সঙ্গেই বুনেছেন

একত্র করে'। লিরিকগুলো ছন্দের দোলায় কর্ণেন্দ্রিয়কে আদর করে। এবং দুটি তিনটি নিঃসন্দেহেই বঙ্গ-গীতির 'স্বর্ণ ভাণ্ডারে' স্থান পাবার যোগ্য। বলতেই হবে সুধীন্দ্রনাথ ওস্তাদ কবি : ছন্দ তাঁব সর্ব্বদাই নিখুঁত ; এবং 'অর্কেষ্ট্রা' কবিতার বর্ণনার অংশে আঠারো মাত্রা পয়ার নিয়ে তিনি যে-দুঃসাহসী পরীক্ষা করেছেন তাতে আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছি। পয়ারে যতি-পাতের কতগুলো নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তার ব্যতিক্রম হ'লেই কানে খটকা লাগে : যে-কারণে মধুসূদনের 'অকালে'র পর যতিপাত এত বড় মির‍্যাকল্। সুধীন্দ্রনাথ এই পয়ারকে ভেঙে চুরে মুচড়িয়ে যেমন খুসি চালিয়েছেন, চালিয়ে নিতে পেবেছেন একমাত্র 'আঁর্জাবমা'র জোরে—মধুসূদনেরও সেই জোরই ছিলো—এবং আমার কানে তো কোথাও বিশেষ খটকা লাগেনি। এ-ধরণের পরীক্ষা আরো কবলে সুধীন্দ্রনাথ আমাদের পয়ারের পরিধি অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারবেন এ-বিশ্বাস আমার আছে।

বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ দাশ

হায়, চিল—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাক' উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটিব পাশে !
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে !
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মত সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদোনাক' ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকাব মেঘ
আকাশ কি সব মনে রাখে।
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব।

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাক,
অবণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইযে পড়ে
গলানো সোনাব মত রোদ

গলানো সোনাব মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায়,
সোনাব পাখায
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসেব স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়বার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য্য-মোছা মেঘ বাশি রাশি।
তবু আজ হৃদয়েব
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হতে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে,
ষ্টেপির দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হতে
আজিকাব নীল দিন
জীবনেব দিগন্তে ছড়ায়,
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ডাক

তার সাথে আর হয় না আমার দেখা,
কী জানি সে এখন কোথায় থাকে;
নিশীথ রাতে তারার চিত্রলেখা
তবু আমায় তার কাছে আজ ডাকে।

হয়তো সেদিন শুধুই দেহের টানে
তাকিয়েছিলো সে মোর মুখের পানে।
ফাগুন কেবল বাহু বরদানে
কল্পলতার কান্তি দিলো তাকে।
আজকে তবু আত্মা আমার একা,
জানিনা আর কোন্‌খানে সে থাকে॥

বুঝেছিলেম সেদিনে, আজ আবার
এই কথাটাই নূতন ক'রে বুঝি
ইচ্ছা ছিলো তার কাছে যা পাবার
সেই অমৃত করেনি সে পুঁজি।
তার ছিলো যা, সব জীবেরই আছে,—
সেই ঋজুতা য়ুকালিপ্‌টাস্‌ গাছে,
তেমনি ক'রেই মত্ত ময়ূর নাচে,
সেই প্রদাহ পশুর চোখেও খুঁজি।
যৌন জাদু নিমেষে হয় কাবার
বুঝেছিলেম সেদিন, আজও বুঝি॥

তবু যখন মধুফুলের বনে
জ'ড়িয়ে ভুজে অদৃশ্য তার কায়া
অতল কালো ডাগর সে-নয়নে
দেখেছিলেম তারার প্রতিচ্ছায়া,
তখন যেন হঠাৎ নিজের মাঝে
শুনেছিলেম সৃজনসেতার বাজে,
ভেবেছিলেম মুঠোর ভিতর রাজে
বিশ্বরূপের অপরিসীম মায়া।
হিরণ্ময়ের কিরণ আহরণে
সহায় ছিলো অদৃশ্য এক কায়া॥

বসন্ত আজ সুদূর পরাহত,
হেমন্ত ওই দোদুল অন্ধকারে;

চুকিয়ে দিয়ে পাওনা দেনা যত
দাঁড়িয়ে আছি খেয়াঘাটের পারে ;
চপল ভ্রমর অন্ধ নেশার ঝোঁকে
আর ফিরে না প্রলাপ ব'কে ব'কে,
মনের চাকের মধুর নিরালোকে
পাড়িয়েছি ঘুম শেষকালে আজ তারে।
তত্ত্বকথাই কেবল ওতপ্রোত
এই নিরাকার নিখিল অন্ধকারে ॥

তবু আবার তারার প্রদীপ জ্বেলে
আমায় প্রাচীন সঙ্কেতে সে ডাকে।
এগিয়ে গেলে জ্ঞানের বোঝা ফেলে
তার দেখা কি পাবো পথের বাঁকে ?
আজ বুঝেছি সেদিন ক্ষণিক ভুলে
যদৃচ্ছ দান দিইনি তারে তুলে,
তীর্থে যেতে চপল চরণ-মূলে
কাটাইনি কাল দৈবদুর্বিপাকে।
সত্য কেবল দেহের দয়ায় মেলে,
তাই সে আমায় ডাকে, আবার ডাকে ॥

অজিত দত্ত

মিস্-

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার।
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্য্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি' মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি',

দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজী,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্ব্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো! বহু প্রেম গর্ব্ব যদি চাহ—
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে
ছাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে,
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি' বহু হ'তে বহুতরদেরে
ঈর্ষায় টানিতে চাও—সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,—
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।

কবিতার পাঠক

সাহিত্যের সকল রূপের মধ্যে কবিতাই পাঠকের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি দাবি করে। কবিতা বলে অল্প, ধরে' নিতে হয় অনেকখানি। অনেক সময় কবিতার কথাগুলো নির্দিষ্ট কোনো খবরই দেয় না; কিম্বা যে-খবরটা দেয় সেটা আপাতত তুচ্ছ। কিন্তু সেই কয়েকটি কথার পারস্পরিক সংযোজনাই হয় এমন যে মোটের উপর ফলটা হয় অলৌকিক; মনে হয় এমন একটা-কিছু বলা হ'লো যা চিরকালের। যেমন ধরা যাক্:

ওপারেতে বৃষ্টি এলো, ঝাপসা গাছপালা

আমার কাছে এ-পংক্তিটি অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতা। কিন্তু এতে যে-খবরটা দেয়া হয়েছে সেটা নিতান্তই সাধারণ, এর মধ্যে কোনোই মহান ভাব নেই, জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনো মন্তব্য নেই। এমনিতে দেখতে গেলে কথাগুলোর অর্থ বিশেষ কিছুই নয়। তবু এই ক'টি কথা ঠিক এইভাবে সাজানো হয়েছে বলে' তারা অনেক-কিছুই বলে, অপরূপ কিছু বলে। ভেবে দেখতে গেলে মনে হবে, কথাগুলো ভাষার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে, হ'য়ে উঠেছে কতগুলো ধ্বনিময় রূপক-চিহ্ন। যেন পর-পর কতগুলো নুড়ি বসানো হ'লো, তার উপর দিয়ে পার হ'য়ে আমরা চলে' এলাম কল্পনার চিরন্তনতায়। এই ধরণের পংক্তি আমাদের কল্পনাকে মুক্ত করে, আর-কিছুই করে না।

কবি অল্প একটু আভাস দিলেন, বাকি অনেকটা আমরা ধরে' নিলাম ; এই যোগাযোগ হ'লো কবিতার সার্থকতা। কিন্তু এই যোগাযোগ কি সকল সময়েই হয়? না যদি হয়, দোষ দেবো কার? কবির, না পাঠকের? বিশেষ একশ্রেণীর পাঠকের জন্যেই কবিতা, এ-কথা বলা কি অসঙ্গত? না কি কবিতার পাঠক 'তৈরি' করা যায়?

আমি অনেকদিন অবাক হয়েছি এই ভেবে যে কবিতা থেকে আমি যে-রকম গভীর আনন্দ পাই, অন্য অনেকেই তো সে-রকম পায় না। এবং তারা যে অবশ্যই অশিক্ষিত বা স্থূলচিত্ত তা কখনোই নয়। এমন লোক তো আশে-পাশে আমরা কতই দেখতে পাই যাঁরা সত্যি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও রুচিসম্পন্ন, কিন্তু কবিতা তাঁরা পড়তে চান না কি পড়েন না কি পড়লেও তা থেকে বিশেষ-কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। অথচ সুশিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ কাব্যরসগ্রহণ এ-রকম একটা সংস্কার নিশ্চয়ই কোনোখানে আছে, নয় তো বিদ্যালয়গুলিতে কাব্যপাঠ আবশ্যিক হ'তো না।

বিদ্যালয়গুলিতে যা-ই হোক্, প্রকৃত কাব্যসম্ভোগ—অন্তত উচ্চতম কবিতার সম্ভোগ—বিশেষ একশ্রেণীর পাঠকের জন্যেই : পৃথিবীতে ভালো কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ-পর্য্যন্ত অন্তত, কবিতার ইতিহাস এই রকমই সাক্ষ্য দেয়। একটা কথা আছে, কবি হ'য়ে জন্মাতে হয় ; কবিতার পাঠক হ'য়েও জন্মাতেই হয় হয়তো। এটা মনের একটা বিশেষ বৃত্তি : যার থাকে না, তার থাকে না। যেমন অনেকে বর্ণান্ধ হ'য়ে জন্মায়, তেমনি অনেকে জন্মায় কবিতা-বধির হ'য়ে—দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ঢের ঢের বেশি। কবি বার-বার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন, তাই খানিকটা কল্পনাশক্তি থাকতেই হবে পাঠকের। তারপর শিক্ষা, চর্চ্চা ও সংস্কৃতির ফলে কবিতা উপভোগের ক্ষমতা ক্রমশই ব্যাপক ও গভীর করে' তোলা যায়, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

এটুকু বলে'ই যদি খালাস হ'তো তাহ'লে ভাবনা ছিলো না। কিন্তু আরো বোধ হয় কথা আছে। সে-কথাটা এই যে সমস্ত মানুষের মনেই কবিতা-প্রীতি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান—এবং সেটা আদৌ শিক্ষা কি বুদ্ধিসাপেক্ষ নয়—তার অনেক প্রমাণ আমরা পেতে পারি। কবিতা না-বলে' ছন্দ বলা ভালো। নির্দ্দিষ্ট ফাঁক দিয়ে-দিয়ে একই রকমের শব্দের পুনরাবৃত্তি নিতান্তই যদি ঢাকের বাজনা না হয় তাহ'লে আমাদের মন তাতে সাড়া দেবেই। এটা মানুষের মধ্যে এমনি মজ্জাগত যে একটা প্রবৃত্তি বললেও দোষ হয় না। ঐরকমের শব্দ শুনতে আমরা ভালোবাসি ; তাতে শ্রম লাঘব হয়, মনে শান্তি আসে, এবং মনের সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রকাশ

করতে চাইলে ঐরকম শব্দ দ্বারাই যেন সব চেয়ে ভালো হয়। শিশু গুনগুন্ গান না-শুনলে ঘুমোবে না, বৃষ্টি পড়লেই ছোটো ছেলে চেঁচিয়ে ছড়া আওড়াবে, মাঝি নৌকো বাইতে-বাইতে গান করবেই, সুর করে' চীৎকার না-করলে কোনো ভারি জিনিস ঠেলাই যাবে না। এই সুর-করে'-বলা কথার অতি আশ্চর্য্য ও বিচিত্র ক্ষমতা, এবং জীবনের সকল উপলক্ষ্যেই এর ব্যবহার আছে, এটা মানুষের বহু পুরোনো আবিষ্কার। যুদ্ধে কি বিবাহে, কাজে কি উৎসবে এই সুর না-হ'লে মানুষের কখনো চলেনি। তাই সকল দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই এত বিচিত্র ছড়া গানের ছড়াছড়ি। অসভ্যদের আর-কিছুই নেই; কিন্তু এই সুর ক'রে চ্যাচানো তাদেরও আছে।

তত্ত্ববিদ বলেন, এখানেই মানুষের কবিতার উৎস। এখান থেকে শুরু করে' কল্পলোকের দুরূহ চূড়া পর্য্যন্ত উঠেছে মানুষের কবিতা। এই ছন্দটা হচ্ছে আদিম ও প্রাথমিক ব্যাপার, এর প্রভাব সকল মানুষের উপরেই সমান। এক হাজার সৈন্য তালে-তালে পা ফেলে চলে' গেলে আমার মন যেমন নেচে উঠবে, ঠিক তেমনি নাচবে একটি শিশুর কি একটি চাষার মন। এখান থেকে আমাদের সকলেরই যাত্রারম্ভ। এখন কে কতদূর পেঁছিতে পারবো সেটাই দ্রষ্টব্য।

শিশুকালে আমাদের প্রায় সকলের কানেই ছন্দ-মিলের ঝমঝমানি ভালো লাগে। তার মানেই এ নয় যে বড়ো হ'য়ে আমরা সবাই কাব্যরসিক হবো। আমরা সকলেই হয়-তো এক ধরণের শিক্ষা পেয়েছি, সকলেই আমরা বুদ্ধিমান ও রুচি-সম্পন্ন, বয়ঃক্রমের সঙ্গে-সঙ্গে মনের যথাযোগ্য পরিণতি হ'লো সকলেরই—কিন্তু কবিতা ভালোবাসার বৃত্তি সকলের সমান বিকশিত হ'তে দেখা গেলো না। যদি দশজনকে নেয়া যায়, তার মধ্যে হয়-তো মাত্র একজন রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মে প্রবেশ করতে পারলো, চারজন পেঁছিলো সত্যেন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত, আর বাকি পাঁচজন হ'লো হয় কবিতা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, নয় এমন সব 'কবি'র ভক্ত যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ না-করাই ভালো মনে করলুম। (সুবিধের জন্য এখানে ধরে' নিচ্ছি যে কোন্ কবি ভালো আর কোন্ কবি কম ভালো সে-বিষয়ে আমার পাঠকরা আমার সঙ্গে মোটামুটি একমত।)

উপরকার উক্তিটা যে নেহাৎই আনুমানিক নয়, একটু এদিক-ওদিক তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারবো। কবিতা যত অল্প লোক পড়ে বলে' প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে আসলে বোধ হয় তা নয়। কবিতা পড়ে অনেকেই, তবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা পড়ে। এ-কথা বলতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই যে

বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব বেশি পঠিত হয় না—'কথা ও কাহিনী' বাদ দিয়ে। (এবং 'কথা ও কাহিনী'ও যে ছড়িয়েছে তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপা, বিখ্যাত অভিনেতাদের আবৃত্তি এবং ও-রচনাগুলির আবৃত্তিযোগ্যতা)। সত্যেন্দ্র দত্ত ও নজরুল ইসলামের প্রচার অনেক বেশি। এমন কি, সাধারণ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় যে-সব মিলের টুংটাং বেরোয়, তার পাঠকের সংখ্যাও নেহাৎ অল্প নয়। এর বেশির ভাগই হয়-তো কবিতা নয়, কিন্তু গল্পও তো নয়, অন্তত কবিতার মতো দেখতে। 'কবিতা' পড়বার ঝোঁক অনেক লোকের মধ্যেই আছে। তবে এমন কেন হয় যে সকলেই রবীন্দ্রনাথ পড়তে ভালোবাসে না? অধিকাংশের আকর্ষণই কেন নিকৃষ্টের দিকে? এর সব চেয়ে সোজা উত্তর অবশ্য এই যে, স্বভাবতই সকলের মধ্যে সব জিনিস থাকে না, যে-বৃত্তির সাহায্যে ভালো ও মহৎ কবিতা উপভোগ করা যায় সেটাই অনেকের মধ্যে অনুপস্থিত, এবং এ-কথাটা অকুণ্ঠে মেনে নেয়াই বোধ হয় ভালো। অধিকাংশ মানুষের মনের রচনাই এমন যে নিচু জাতের পদ্য না-হ'লে সেখানে কোনো ছায়াই পড়বে না। জনতার কবিরা তাঁদের অজস্র রচনার দ্বারা একটি ন্যায্য ও বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষাই মেটান সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ-উত্তরে মন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ'তে চায় না। এটা ধ'রে নিচ্ছি যে ভালো কবিতা উপভোগ করা ভালো জিনিস, এবং কোনো সমাজে যত বেশি লোক সেটা করে, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। যাকে পপুলার আর্ট বলে তার উচ্ছেদ কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণভাবে রুচির বিকাশ ঘটানো হয়-তো যায়। সেই উদ্দেশ্যে অনেক সমালোচকের লেখনী নিয়োজিত হয়েছে ও হবে। কখনো-কখনো একটা দেশের রুচি নষ্ট হ'য়ে যেতে থাকে, আবার কখনো সাধারণ কালচারের স্তর এত উঁচুতে ওঠে যে ভালো কবিতা অনেকেরই অধিগম্য হয়। নির্বোধ কি মূর্খের কথা বলছি না, কবিতার নাম শুনলেই যে নাক শিঁটকোয় তার কথাও নয়—কিন্তু সাধারণরকম শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, সাধারণরকম কাব্যপ্রিয় মানুষ তেমনি কোনো রুচি ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় যে উপকৃত না-হ'তে পারে তা নয়। যে-বৃত্তি দিয়ে ভালো কবিতার উপভোগ সেটার উন্মেষ তার মধ্যে হ'তে পারে। এটা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে এমন কথা জোর করে বলবার উপায় নেই, সম্ভাবনা হিসেবেই বলছি। সম্ভাবনাটাও সকলের পক্ষে নয়, কারো-কারো পক্ষে। কবি তৈরি করা যায় না, কিন্তু অনুকূল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠক তৈরি হ'তে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প কিছু বাড়ানো যেতে পারে, এবং ভালো পাঠক যত বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।

শিকার

ভোর—
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মত কোমল-নীল ;
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ।
একটি তারা এখনও আকাশে র'য়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মত ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের
গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে একরাতে—তেম্নি—
তেম্নি একটি তারা আকাশে জলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জেলেছে,—
মোরগফুলের মত লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জলছে তাদের ;
সূর্য্যের আলোয় তার রং কুম্কুমের মত নেই আর ;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মত।
সকালের আলোয় টল্মল্ শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের
সবুজনীল ডানার মত ঝিল্মিল্ করছে।
ভোর ;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মত অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জ্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল।

এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবীলেবুর মত সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—

ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মত একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মত একটা বিস্তীর্ণ
উল্লাস পাবার জন্য ;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্য্যের সোনার বর্শার মত জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্য্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য ।

একটা অদ্ভুত শব্দ ।
নদীর জল মচ্‌কাফুলের পাপড়ির মত লাল ।
আগুন জ্বল্‌ল আবার,—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এল ।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প ;
সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক,—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

আমার এ রাত ত ভ্রমর

১

আমার এ রাত ত ভ্রমব ।
বৃন্তচ্যুত অন্ধকার
মধুগর্ভ হল তার
কামনার ডাকে ।
দুষ্প্রেক্ষ্য চোখের আলো নিবাও ভ্রমর ।
তারাদের বিন্দু বিন্দু প্রশ্নের আভাস
ভরেছে আকাশ ।
জীবনের সৌরক্ষণগুলি,
কী দুষ্প্রেক্ষ্য চোখ !
তোমার ও গুঞ্জনের ধুলি

ঢাকুক তাদের
মেঘাক্রান্ত কৃষ্ণপক্ষ নিভাক সে লোক।

২

অনুবীক্ষণই যদি
মেলে দাও চোখে,
অতীতের ক্ষীণ প্রান্ত
যদি দেয় ধরা
নিষ্পত্র শীতের যুগে
পাতার কঙ্কাল হবে সাথী।
তবু এ ভ্রান্তির পরিণয়
ফোটাবে কি ফুল—
ধরাবে কি ফল?
জীবনেব পশ্চিমে প্রদোষ
উড়াবে ক্লান্তির ধূলি
ছায়া হবে দীর্ঘতর
জন্মলোক পানে।

সমর সেন

মরুভূমিতে মৃত্যু

অলকা

কাব নীল চোখে
এখনো সমুদ্রের গভীবতা কাঁপে,
ট্র্যামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসব সহর।
আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে
নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে,
ট্র্যামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর সহর।

রাত্রে, চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

অকাল বসন্ত

মহাকাল আজ আমাদের সামনে কাঁপে,—
শোনো, দক্ষিণের হাওয়ায় শোনো,
নতুন জীবনের দুরন্ত ঝড়,
বুনো হাঁসের দল রোদে-ভরা সমুদ্রের দিকে
তাদের শুভ্র ডানা মেলল,
সামনে দূর সমুদ্রের দীপ্ত দিন।
—আজকের হাওয়ায় শুনি শেষ শত্রুর পদক্ষেপ,
টুকরো টুকরো আশা আর আনন্দ আর শব্দের শেষে
অদৃশ্য শত্রুর পদক্ষেপ।

স্বর্গ হতে বিদায়

ম্লান হয়ে এলো রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে সহর হে ধূসর সহর
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর।
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
তখন সাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে সহর হে ধূসর সহর।

'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী',
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে

কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,
তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

মদনভস্মের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো,
রাত্রে ধূসর প্রেম : কুসুমের কারাগার।
কতো দিন, কতো মন্থর, দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কতো মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

যুবনাশ্ব

শীতলপাটি

চিকণ শীতলপাটিটি বিছানো দখিন-দুয়ারী ঘরে
গাল তারি 'পরে,
মাথার বালিশ কখন গিয়েছে সরে।
এ পাশে গড়ায় হালের প্রবাসী,
এলোমেলো, পাতা খোলা।
পড়ন্ত বেলা, এখনো ঘুমোয় আপন ভোলা।

শাড়ির আঁচল গায়ে নেই,
নেই খোঁপায় চুলের কাঁটা।

থরথর কাঁপে চম্পকাধর দিনের দুঃস্বপনে।
যদি দোষ হয়
পরে মাপ কোরো, না হয় কোয়ো না কথা।
এখন ত আমি ওষ্ঠপ্রান্ত এঁকে দেব চুম্বনে।

গালেতে পাটির লেগেছে দাগ,
ঠোঁটেতে আমার চুমো।
চোখের প্রশ্ন, ভালোবাসি কিনা,
কাল হবে।
আজ ঘুমো।

প্রকৃতির কবি

বিদ্যালয়ে ইংরিজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি তখন সহজবুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন্ কবি নন্? প্রকৃতির অফুরন্ত লীলাবৈচিত্র্য অন্তত কখনো-কখনো ভালো না লাগে এমন নিরেট সাধারণ লোকের মধ্যেও যখন দেখা যায় না, তখন কবিনামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিকে অতি তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে এ তো জানা কথা। শেক্‌স্‌পিয়র কি প্রকৃতির কবিও নন? শেলি? কীট্‌স? যদি বলা হয় যে ওয়ার্ডস্বার্থ জড়প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও সর্বব্যাপক সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন—সত্যি বলতে, সকল কবির কাছেই প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ-উপলব্ধি শেলির মত তীব্র অন্য কোন্ কবিতে তা জানিনে। যদি বলা হয় ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম ছিল তাঁর পক্ষে ধর্মের সামিল সে-কথা মানবো, কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর নির্বাসিত ডিউক খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything'? এর চেয়ে বেশি ওয়ার্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

তবে এটা সত্য যে প্রকৃতি ছাড়া অন্য-কোনো বিষয়ে ওয়ার্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, লিখলেও সফল হননি। সেইজন্যে ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি লেবেল-আঁটা। কবিদের গায়ে লেবেল আঁটা থাকলে ডক্টরেট ডিগ্রি-

কামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওয়ার্ডস্বার্থেরই দখলে ; প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুনরকমের অনুভূতি ও আবেগ পরবর্তীযুগের যে-সব কবিতে পাওয়া যায়—যেমন ডেভিস, এড্ওয়ার্ড টমাস —তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হ'তে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের মনো-ভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং ভিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই হয়তো বেশি উপভোগ্য হ'তে পারে।

আমাদের কবিদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই তো সোজাসুজি ঋতুসংক্রান্ত। তা ছাড়া, তাঁর 'জীবন-দেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে ; গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি 'আধ্যাত্মিক' গ্রন্থও এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য দেবে।

অবশ্য একহিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ-কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কি প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা ; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, অনেকের পক্ষে প্রেমের উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ামাত্র। প্রকৃতিকে অতি নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই ; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।

আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায় : তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এই কথাই আমার মনে হ'লো। অবশ্য এই বইয়ের কবিতাগুলো আমার পক্ষে একেবারে নতুন নয়। এদের রচনার কাল আজ থেকে এগারো বছর ও সাত বছরের মধ্যে ; এবং সেই সময়ে এরা যখন অধুনালুপ্ত কয়েকটি মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জীবনানন্দর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক ১৩৩৪ সালে বেরিয়েছিলো, এবং তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে নিশ্চয়ই। সে-বইখানা তখনো কারো বিশেষ নজরে পড়েনি, এখন তো একেবারেই বিস্মৃত। মোহিতলালের স্বপন-পসারীর মত, ঝরা পালকেও সত্যেন দত্তর প্রভাব ছিলো স্পষ্ট। যে-মৌতাতের ঝোঁকে মোহিতলাল এই লাইন লিখতে পেরেছিলেন—

উটপাখী তার ডিমজোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে

সেটা জীবনানন্দও এড়াতে পারেননি তখন। ঝরা পালকে স্মরণীয় বিশেষ-কিছু হয়তো ছিলো না, কিন্তু তার কয়েকটি লাইন দেখছি আজো ভুলতে পারিনি :

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিমফুলের মত ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মত গোলাপি রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে—স্বপ্নে—কতদিন।

সত্যেন দত্তীয় ঝঙ্কার থেকে এ অনেক দূরে, অতি পুরোনো কল্পনা যেন একটি নতুন ও অপূর্ব রূপ পেয়েছে এখানে। তার কারণ ছন্দের নবত্ব, ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম, এ-ছবির রচনায় যে কলাকৌশল লেগেছে, তা এই কবিরই নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দর নিজস্ব সৃষ্টিপ্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায়, পড়তে-পড়তে মনে হয় একজন নতুন কবির বুঝি দেখা পেলুম।

এই সৃষ্টিপ্রেরণা অবশ্য চাপা থাকলো না, অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেলো তার প্রগতি ও পরিণতি। যে সময়ে জীবনানন্দ সে-সব কবিতা বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন তা প'ড়ে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলুম, এবং এখন সেগুলোই দেখতে পাচ্ছি ধূসর পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত। ভালো কবিতার কেমন একটা আশ্চর্য অপূর্বতা আছে মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন, এইমাত্র এই মুহূর্তে এর জন্ম হ'লো, এবং চিরকালের মধ্যে এর মতো আর কিছু হবে না। এই কবিতাগুলোয় ছিলো সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা, প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা স্বর বুকে এসে লাগলো, যেরকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই স্বর, আর এমন অদ্ভুত যে চমকে উঠতে হয়।

বছর দশেক পরে সেই কবিতাগুলোই আবার প'ড়ে সেইরকমই ভালো লাগলো। ইতিমধ্যে জীবনানন্দর কাব্যপ্রেরণা ঝিমিয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ 'সহজ' 'কয়েকটি লাইন' এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরিজি কাব্যস্রোতে প্রচুর পান করেছেন তিনি, 'জীবন' 'প্রেম' এই দীর্ঘ কবিতাদুটিতে শেলি কীট্‌স উভয়েরই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলির চাইতে বরঞ্চ কীট্‌সের প্রভাব বেশি, কীট্‌সের চাইতে বরঞ্চ সুইনবর্ন ও প্রিব্যাফেলাইটদের। এবং সব চেয়ে বড়ো কথা যেটা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃজনী-

শক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হ'য়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ছোট-ছোট জিনিস নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণ ধরা দিতে চায় না।

বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে মনে হয় যেন এই কবিতাগুলো আঁকাবাঁকা জলেব মতই ঘুরে ঘুবে একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা, আমাদের পবিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে, অন্য কোনো আকাশে অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথার বচনা। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্ত্তনশীল, মৃত্যুতে সব জিনিসেরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যেব ভিত্তি।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে,—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।…
পৃথিবীব দিন আব বাতেব আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আব,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা,—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা!

তিনি সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সব চেয়ে সক্রিয়। তাঁব কল্পনা সর্বদাই নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতব পরিণতিব দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যেব বাজাবে তাঁব খ্যাতিব বোল ওঠেনি। আমাদে৷ সুধীশ্রেণীও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, এমন মনে হয় না। আধুনিক বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্য্যন্ত দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। জীবনানন্দর ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ ছাড়া এই অন্যায়ের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানিনে। কবিতা ছাড়া আর কিছু তিনি লেখেন না, কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হ'য়ে দেশেবিদেশে আত্মরটনার আয়োজন তিনি কখনোই করেননি। আমার বিশ্বাস, এ-পর্য্যন্ত দু'জন চারজনের

বেশি অনুরাগী পাঠক তাঁর জোটেনি। তবে এটাও লক্ষ্য করবার যে অতি-আধুনিক বাঙলা কাব্যে তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

২

আমাদের বাঙলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, তবে গুণী যাঁরা, কাব্যসম্ভোগের প্রকৃত অধিকারী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ধূসব পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পর তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ-আশা জোর ক'রেই করা যায়। ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এ-কথাই প্রথমে মনে হয় যে এই লেখকের আছে সত্যিকারের স্টাইল। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম), এবং তা নিয়ে ঠাট্টা করাও খুব সোজা। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে ইয়ারকির বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে এ-কথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি ও প্রকৃতিব কবি। ঠিক প্রেমেব কবিতা বলতে যা বোঝায় ধূসর পাণ্ডুলিপিতে তা একটিও নেই।

ইয়েট্‌স-এর লাইন মনে পড়বে অনেকেরই ; এ-কথা অনেক কবিরই মনের কথা সন্দেহ নেই। স্বপ্নের হাতে ধবা দিতে চান যে-সব কবি তাঁদের প্রত্যেকেরই 'স্বপ্ন' বিশেষ একটি রূপকথার মূর্ত্তিগ্রহণ কবে। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।

তার পর,—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,—
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াসা
দিকে দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখীর ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়কড়্ !
শসাফুল,—দু' একটা নষ্ট সাদা শসা,—

মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়্সা
লতায় পাতায় ;—
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়,—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

('মাঠের গল্প')

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ ;
অবসর আছে তার,—অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,—
এটুকু সময় তাই কেটে যাক্ রূপ আর কামনাব গানে !

*   *   *

এখানে নাহিক' কাজ,—উৎসাহেব ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিক ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথাব অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছিব শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয় !
সকল পড়ন্ত রৌদ্র চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

('অবসরের গান')

কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ !—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উচুনীচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে ; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন্ !
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা,—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে !

ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে!
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—সাদা,—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের চোখ মুখ ভিজে,—
ফেনার সেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকেব থেকে ঝরে
উত্তর সাগবে!

('পরস্পর')

এই সমস্ত রচনায় আধো আলোর লীলা, আধো ঘুমের মোহ, এই আবছায়ায়, এই অলসতায় কবিব মুক্তি।

জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় রূপক রচনার অজস্রতা, সেই রূপকের বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায় যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন সেগুলো ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক, চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সব চেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সব চেয়ে কম বুদ্ধিগত, সব চেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত। তাঁর এই বিশেষত্বই কীট্‌স্ ও প্রিব্যাফেলাইটদেব কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর একটি কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রযুজ্য। কথা দিয়ে ছবি আঁকতে তাঁব নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর, ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে। গন্ধ ও স্পর্শ দিয়ে অনেক অপরূপ অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্রহ করি; কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জীবনানন্দর মত পূর্ণমাত্রায় আমাদের আর কোন্ কবি ব্যবহার করেছেন জানি না। তাঁর যে কবিতাটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি ছবি উদ্ধার করছি:

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা

নির্জ্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসের ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

('মৃত্যুর আগে')

এই ছবিগুলি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; স্পর্শ আর গন্ধ তো আছেই, রসনার স্বাদও একেবারে বাদ পড়েনি । এ তো সত্যি কথা যে আমাদের সমস্ত অনুভূতিই শরীরের মারফৎ এসে পৌঁছয় ; অথচ কবিতায় এই অনুভূতিগুলোর অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না কি করতে পারেন না, উপরন্তু যদি কেউ করেন তাঁর কপালে অজস্র নিন্দাই জোটে । কীট্‌স্ যে 'sensuous' মাত্র, 'sensual' নন, সেটা প্রমাণ করতে অধ্যাপকরা গলদ্‌ঘর্ম ! এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জন্যেই রসেটি স্যুইনবর্নের লাঞ্ছনা । আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়েব অনুভূতি সম্বন্ধে এই সূক্ষ্ম চেতনা জীবনানন্দের মত আর কারুরই নেই ; তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই ; কোনো কৃত্রিমতা কি অনুকরণ নেই ; তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি ; তা নিছক কবিতা, কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

৩

পরিশেষে আঙ্গিকের দিক থেকে দু' একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি । জীবনানন্দর কান নিখুঁত । ছন্দকে ইচ্ছামত বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন, যেখানে আটকেছে সেখানে আটকানোটাই কবির উদ্দেশ্য ছিলো । একই ছন্দের ছাঁচ বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন সুরে বাজে এটা পুরোনো কথা ; ধূসর পাণ্ডুলিপি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত । এ-বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে ; বেশির ভাগ অসমমাত্রার, যাকে বলতেই হয় বলাকার ছন্দ । অর্থাৎ চেহারাটা বলাকার ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একবারেই ভিন্ন । বলাকার তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে ;

এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে ক'রে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা, এ-ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে ভরা সুদূর এর সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়। কলা-কৌশলের অভাব নেই এই কবিতাগুলিতে, সেগুলোর প্রধান গুণ এই যে তারা প্রচ্ছন্ন। মিলে, অন্তর্লীন মিলে, অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রতি পংক্তিতে বেজে উঠছে, সে যেন অপার্থিব ও পলাতক, স্বপ্নের সুরঙ্গে অলস ভাবনার যাওয়া-আসা।

বোম্বায়ের সহরের জাহাজ কখন
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই ;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায় ; কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখীদেব ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে।

('শকুন')

ধ্বনির দিক থেকে এর চেয়ে ভালো রচনা ধূসর পাণ্ডুলিপিতে নেই। এই ধ্বনি উচ্চ নয় তীব্র নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে এতখানি কৃতিত্ব আর কোনো আধুনিক কবির দেখিনি। জীবনানন্দ নাম-শব্দ ব্যবহার করেন মিলটনের মত জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করতে নয়, প্রির্যাফেলা-ইটদের মত ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়িনী মালবিকা প্রভৃতি পুর-যুগের নাম যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধিত করেছেন বোম্বাই বনলতা সেন প্রভৃতি আধুনিক 'কবিত্ব'হীন নাম দিয়ে।

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুটফুট ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে !

('পাখীরা')

ইংরিজি শব্দগুলোকে বাঙলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য্য বলতে হয়। একটু খোঁচ নেই। এটাও লক্ষ্য করবার যে জীবনানন্দর পয়ারে যুক্তাক্ষর কম। যুক্তাক্ষরের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু এই কবি একটি লাইনও লেখেননি যাতে ঋজুতা, দৃঢ়তা কি গাম্ভীর্য্যের অভাব। বরঞ্চ, যুক্তাক্ষরের স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার ক'রেছেন যাতে পয়ারে লেগেছে নতুন সুর।

এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি, এবং ধূসর পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমার নিজের তাঁর কবিতা অত্যন্তই ভালো লাগে, কিন্তু আশা করি নেহাৎই আমরা ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা এই মতামত গঠিত হ'তে দিইনি। আমাদের দেশে কোনো ক্ষেত্রেই কোনোরকম স্ট্যাণ্ডার্ড নেই, সাহিত্যে একেবারেই নেই। প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে। আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন সমাজের মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে নাড়া দেয়াই দরকার, নিজের বিশ্বাসটা মাঝে-মাঝে জোর ক'রেই বলা দরকার। এ-দেশে মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (যদি আজকালকার দিনে এমন কেউ থাকেন) তাঁরা ধূসর পাণ্ডুলিপি নিজের গরজেই পড়বেন; কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তারা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন। বিশেষ ক'রে, 'শকুন', 'পাখীরা', 'অবসরের গান', 'মৃত্যুর আগে', 'ক্যাম্পে' এ-সব কবিতা প'ড়ে তাঁরা স্বতঃই উপলব্ধি করবেন যে, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

নতুন কবিতা

ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকা। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দুই টাকা।

কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আমি একটি মত পোষণ ক'রে এসেছি। হয়তো সেটা নেহাৎই ব্যক্তিগত, তবু এখানে বলি। অতি বিখ্যাত কি অতি মহৎ কাব্যের অনুবাদ চেষ্টা করাই উচিত নয়—আর যদি এ-দুঃসাহসী চেষ্টা না-করলেই নয় তবে ছন্দ-মিল বজায় রেখে নিকট অনুসরণ না-ক'রে মুক্তছন্দের গদ্যে করাই যুক্তিসঙ্গত। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, অপেক্ষাকৃত মাঝারি কবিতাই তর্জমা করবার পক্ষে

ভালো। যদি কেউ মনে করেন আমি নিজে কোনো মহৎ কবিতার অনুবাদে হাত দিইনি কি হাত দিয়েও সফল হইনি, আমার এ-মতের এ ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নেই, তাহ'লে দু' একটা দৃষ্টান্ত দিই। শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর ছাত্রাবস্থায় কীট্সের ওড টু নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি কয়েকটি পল্‌গ্রেভ রত্নের ভাবান্তর সাধন করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ ব্যর্থ হয়েছিলো বললে তাঁর উপর দোষারোপ করা হয় না। ঐ কবিতা এবং ঐরকম কবিতার অনুবাদ ব্যর্থ হ'তেই বাধ্য এ-কথাই আমার মনে হয়েছিলো তখন। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় শেলির 'One word is too often profaned' কবিতার বিভিন্ন অনুবাদ প'ড়ে আমার এ-মত আরো দৃঢ়ই হয়েছিলো। যতদূর মনে করতে পারি, ঐ পত্রিকাতেই শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের শেলির রাত্রি কবিতার অনুবাদ এর একমাত্র ব্যতিক্রম। কপালগুণে ও-রকম তর্জমা হয়।

সত্যেন দত্তর কথা ভাবুন। কবিতার অনুবাদে এমন পরিষ্কার হাত আর-কেউ দেখাননি ; কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত কীট্স্-এর লা বেল্ দাম্ নয়, নোগুচির গুহারু কবিতা। নানা ভাষা থেকে যত ছোট-ছোট উজ্জ্বল রচনা তিনি মাতৃভাষায় আহরণ করেছিলেন তার কোনোটিই কাব্যপর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে না; সেগুলো ভালো কবিতা. কিন্তু মহৎ কবিতা নয়, এবং অনুবাদকের কৃতিত্বের সেটাও একটা কারণ। সত্যেন্দ্রনাথ ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড তর্জমা করতে যাননি. এ জন্য তাঁর প্রশংসাই করবো। মহৎ কাব্যের অনুবাদ প্রায় অসম্ভব।

তবে একেবারেই যে অসম্ভব তাও বা বলি কেমন ক'রে? যা এ-পর্য্যন্ত হয়নি সেটা কখনোই হবে না এটাও অন্ধ ধারণা বইকি। প্রতিভা থাকলে কী না হয়? সফোক্লিসের ঈডিপস ইয়েটস তো ইংরিজি পদ্যে লিখেছেন। আমি এক বর্ণও গ্রীক জানিনে; তবু সাহস ক'রে বলবো যে ইয়েটস-এর অনুলিখন যত ভালো, সফোক্লিসের রচনা যদি ঠিক ততটাই ভালো হয়. তাহ'লেও তাঁর বিরাট খ্যাতি সার্থক। ফিটজেরাল্ড ইত্যাদি মামুলি উদাহরণ তো আছেই। ক্ষমতা থাকলে বাঙলায় শেক্সপিয়র কি ব্রাউনিঙই বা অসম্ভব হবে কেন?

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ব্রাউনিঙের একটি দুটি নয়, পঞ্চাশটি কবিতা তর্জমা করেছেন এ-কথা শুনতেই অবাক লাগে। এই লেখকের পরিচয় তাঁর নামে নয়, তাঁর রচনায়। আপনি হয়তো মৈত্র মহাশয়ের বহু কবিতা প'ড়েও আজো তাঁর নাম জানেন না। বিভিন্ন ও বহু ছদ্মনামে বিভিন্ন ও বহু সাময়িক পত্রে গদ্যে ওপদ্যেঅনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর প্রধান গুণ এই যে তিনি ভালোও লেখেন, অজস্রও লেখেন; তাঁর কল্পনার কৃপণতা কি কলমের ক্লান্তি নেই। কবিতার অনু-

বাদেও তাঁর প্রচুর উৎসাহ ; এবং একমাত্র অনুবাদ-রচনাতেই তিনি স্বনাম স্বাক্ষর করেন। অনুবাদ-শিল্পী হিসেবে এই বইখানি তাঁর প্রামাণ্য সৃষ্টি।

প্রথমেই তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সকল ইংরেজ কবির মধ্যে ব্রাউনিঙের যে তর্জমা হ'তে পারে এ-কথা ভাবতে আমার তো কখনো সাহস হয়নি কি হ'তো না। কেননা ব্রাউনিঙ শুধু যে মহৎ কবি তা নয়, তাঁর রচনা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। যে-সব কবির ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রখর, তাঁরা অনুবাদে কিছুতেই ধরা দিতে চান না ; এবং ব্রাউনিঙের সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মহিমায় ও মুদ্রাদোষে, প্রতিটি কথায় ও কমা-ফুটকিতে। ব্রাউনিঙ পড়াটাই তো এক-এক সময় মানসিক মল্লযুদ্ধ, তাঁর অনুবাদ না জানি আরো কতগুণে মল্লযুদ্ধ !

কিন্তু মৈত্র মহাশয়ের এই বইখানাতে মল্লযুদ্ধের চিহ্নমাত্র নেই। এত সহজে তিনি অনুবাদ ক'রে গেছেন যে দেখে অবাক লাগে। অবশ্য তার ফলে কবিতা-গুলোও অত্যন্ত সহজ হ'য়ে গেছে। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে না-ব'লে দিলে ব্রাউনিঙ ব'লে বুঝতেই পারতুম না। ব্রাউনিঙকে অত্যন্ত তরল ক'রে নিয়ে তরল বাঙলা পয়ারে অনায়াসে তিনি লিখে গেছেন, তারই মধ্যে চেষ্টা করেছেন মূল কবির ছন্দ মিল মোটামুটি অনুসরণ করতে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাউনিঙের রীতিবৈশিষ্ট্য কিছু ফোটেনি ; অন্যদিকে, অনুবাদকের স্বাধীন কবিত্বশক্তি পদে-পদে মূলকে অনুসরণ করতে গিয়ে চাপা পড়েছে। মৈত্র মহাশয়েরই লেখা ভালো কবিতা পডতে পেলে আমরা খুসি হতুম ; কি গদ্যছন্দের রচনায় ব্রাউনিঙের ভাববস্তু আরো বেশিমাত্রায় পাওয়া গেলেও ভালো ছিলো। ব্রাউনিঙের রচনারীতি ছিলো অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, কখনো-কখনো উৎকট ; সেটা নিজস্ব ক'রে নেয়া যদি অসম্ভব, তবে নিজেরই ধরণে ভালো কবিতা তৈরি করলে ব্রাউনিঙ কি অনুবাদক কারুরই ক্ষতি হ'তো না। মনে করুন 'ঘরে-বাইরে'তে 'ক্রিস্‌টিনা'র প্রথম দু'লাইনের তর্জমা :

> আমায় ভালোবাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা
> তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে নয়ন হানা ?

এ তো একেবারেই রবিঠাকুর, কিন্তু ভিতরের উপাদানটা ঠিকই ব্রাউনিঙের। এই পংক্তি দুটি মৈত্র মহাশয় করেছেন এই :

> উচিত ছিল না তার সে চাহনি হানা মোর 'পরে
> না ছিল যাচনা যদি প্রাণে তার মোর প্রেম তরে :

পাশাপাশি এই দুই পদ্য পড়লে আমার অর্থ স্পষ্ট হবে। তারপর মূল ব্রাউনিঙের

সঙ্গে খানিকটা তুলনা ক'রে দেখা যাক। নিচের এই কবিতাটি আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত :

Escape me ?

Never—

Beloved !

While I am I, and you are you.

So long as the world contains us both,

Me the loving and you the loth.

মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদ :

আমারে এড়াবে তুমি ভেবেছ কি মনে ?

—কভু নয়, জেনো এ জীবনে।

যতদিন ভবে

আমি র'ব আমি, আর তুমি তুমি র'বে,

—আমাব অনুসরণ, পলায়ন তোমাব সতত,

তুমি বিমুখিনী নাবী, প্রেমাকুল আমি অবিরত।

ইভেলিন হোপ্-এর প্রথম দু' লাইন :

Beautiful Evelyn Hope is dead !

Sit and watch her side an hour.

অনুবাদে হয়েছে এই :

সে যে হায় নাই আব ! সুকুমার ফুলের মতন

ছিল যাব মুখখানি, হরিল সে কুমারী রতন

মবণ আপন হাতে। বসে আছি শবদেহ পাশে।

ব্রাউনিঙ যদি আজো বেঁচে থাকতেন এবং যদি তিনি বাঙলা পড়তে পারতেন তাহ'লে এই তর্জমা প'ড়ে তাঁর কী মনে হ'তো জানিনে। কাব্যের 'বিষয়' তো মোটামুটি সব কবিতেই এক, বলবার ভঙ্গিতেই বিশেষত্ব। ব্রাউনিঙ যদি বাঙালি হতেন তাহ'লে 'বিমুখিনী নারী' 'কুমারীরতন' গোছের মরচে-পড়া শব্দ কখনোই তাঁর কলমে আসতো না ; 'সে যে হায় নাই আর !' ব'লে শোক-গাথার সূত্রপাতও তিনি করতেন না। ব্রাউনিঙের প্রধান বিশেষত্ব এইখানেই যে তাঁর কাব্যের ধরণ ছিলো ঠিক কথা বলার ধরণ ; একদিকে তাঁর শব্দসম্পদ যেমন বিশাল ও

অসাধারণ ছিলো তেমনি অতি গভীর অতি সূক্ষ্ম কবিতাও ছোট-ছোট জীবন্ত কথায় একেবারে চলতি ইংরিজিতে তিনি লিখেছেন। একজন আর-একজনের কাছে বলছে: তাঁর প্রায় সব কবিতার ছাঁচই এই। ছাঁচটা গীতিকবিতার নয়, নাটকীয় কবিতার। এই নাটকীয়তা মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদে সঞ্চারিত হয়নি। পর্ফিরিয়াজ লভার-এর রুদ্ধশ্বাস, অসহ্য ব্যাকুলতা ঢিমে তালের ছন্দে কাটা-কাটা শ্লোকে 'মিষ্টি' প্রেমেব কবিতায় পরিণত হয়েছে। জেমস্ লী আমি বরাবর অতি দুরূহ কবিতা ব'লে ভয় ক'রে এসেছি, এই বইয়ে তারও অনুবাদ দেখে রীতিমত অবাক হ'য়ে গেলুম। কিন্তু—

আজি সাগরের তীরে অতি ক্ষুদ্র এ কুটীরে
মোর দোঁহে লভেছি কুলায়।
হানে হিম শিহরণ পউষের প্রভঞ্জন,
অগ্নিকুণ্ড আতপ বিলায়।
পুড়িছে কি এ অনলে, ডুবিল যা সিন্ধুজলে
ভগ্নকাষ্ঠ সে মগ্ন-তবীব?
নৌকাডুবি এই কূলে হ'ল কত যাই ভুলে
হয়ত অতলে মোব নীড়।

প্রাক্-রবীন্দ্র কি বালক-রবীন্দ্র যুগেব বাঙালা কবিতার এই চমৎকাব উদাহরণেব সঙ্গে মনে হয় কি নিচের ইংরিজি লাইনগুলোব কোনো সম্পর্ক আছে?

Is all our fire of shipwreck wood,
Oak and pine?
Oh, for the ills half-understood,
The dim, dead woe
Long ago
Befallen this bitter coast of France!
Well, poor sailors took their chance,
I take mine.

মোটের উপর, ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকায় ব্রাউনিঙই যেন অনুপস্থিত। কোনো কোনো কবিতা খানিকটা কাছে আসতে পেরেছে সেটা মৈত্র মহাশয়ের কৃতিত্ব। মূলে ব্রাউনিঙ যে পড়েনি হয়তো এ-বই প'ড়ে সে খুসি হ'তে পাবে, কিন্তু ব্রাউনিঙকে কিছু পেলো এ-কথা ভাবলে সে ভুল করবে। এই অনুবাদগুলোয় ব্রাউনিঙের প্রকৃত আস্বাদ

পাওয়া যাবে না এ-কথা মৈত্র মহাশয়ের মত রসজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। ব্রাউনিঙের রস ও সুর বজায় রেখে তর্জমা করা এতই কঠিন কাজ যে তার চেষ্টাতেও গৌরব। যেটাকে এখন পর্য্যন্ত অসম্ভবই বলতে হয়, সেটা সম্ভব করতে পারেননি ব'লে মৈত্র মহাশয়কে দোষ দেয়া অন্যায় হবে ; এবং তাঁর এই দুরূহ চেষ্টার জন্য যথাযোগ্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। কোনো একজন বিশেষ বিদেশী কবিকে মাতৃভাষায় মোটামুটি সমগ্রভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা বাঙলা-ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম। এই বই প্রকাশ ক'রে মৈত্র মহাশয় শুধু যে নিজের অসাধারণ কাব্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা নয় ; অনুবাদের দিকে অনেক মূল্যবান কাজের ক্ষেত্র বাঙলা কাব্যে প'ড়ে আছে সে-কথাও আমাদেব মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শ্যামলী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

সম্প্রতি এক বাঙলা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় এক 'সমালোচক' আমাদের জানিয়েছেন : 'রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বাঙলাদেশের সকল কবিই নিকৃষ্ট—এত নিকৃষ্ট যে তুলনা বাতুলতা।' বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নাকি এতই উৎকৃষ্ট কবি যে গদ্যকবিতারূপ 'কচুরি-পানা'ও তাঁর হাতে ফুল হ'য়ে ফোটে। তারই দু' একটি ফুলের সন্ধান এই 'সমালোচক' ভদ্রলোক নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামলীতে পেয়েছেন। ববীন্দ্রনাথ নাকি শ্যামলী প্রভৃতি বই লিখেছেন 'এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য—"ইহা না লেখাই ভালো, কিন্তু যদি নিতান্তই লিখিতে হয়, এই ভাবে লিখিয়ো।"'

গদ্য কবিতা 'যাহার একটুমাত্র লিখিবার ক্ষমতা আছে সেই লিখিতে পারে', কিন্তু 'সমালোচনা' লিখতে হ'লে 'একটুমাত্র' লেখবার ক্ষমতাও দরকার কবে না সেটা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলুম। এমনকি, সামান্যতম বোধশক্তিও না থাকলে তো চলেই, উপরন্তু না-থাকাই ভালো। যে-গদ্যকবিতা 'কাব্যজগতের অপসৃষ্টি' তাবই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে 'সমালোচক' মন্তব্য করেছেন 'অত্যন্ত সুন্দর'। তার কারণ? কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন : লেখক রবীন্দ্রনাথ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন তখন তাঁকে বাহবা দেবার জন্য 'সংযম' 'সংহতি' প্রভৃতি শব্দ কলমের মুখ তৈরিই আছে। অন্যান্য অতি 'নিকৃষ্ট' ক'বিদের হাতে গদ্যকবিতা হ'লো রাশি-রাশি রাবিশ, শুধু রবিঠাকুরের হাতেই ভালো। রবিঠাকুবের হাতে ভালো হ'লো কেন? বাঃ, হবে না, রবিঠাকুর যে! হিজ মাস্টার্স ভয়েস কানে গেলে চিত্ত চমৎকৃত না-হ'য়ে পারে!

'প্রভু তোমার সৃষ্টি বুঝতে পারিনে, ক্ষমা করো,' এই কাতর উক্তি ক'রে পায়ে

লুটিয়ে পড়াটা যখন বাঙলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'সমালোচনা' নামে চলতে দেখি তখন, আর কিছু না হোক, এর প্রকাশ্য নির্লজ্জতাতেই স্তম্ভিত হ'তে হয়। এই ধরণের বুকে-হাঁটা ভঙ্গিতে প্রভুব গৌরব কিছু বাড়ে না, দর্শকরাও লজ্জিত হয়। এই 'সমালোচকে'র মারফৎ জানতে পেলুম যে 'পত্রপুটের ও শ্যামলীর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানেই– তাহারা মুখর নহে।' আমি হাজার লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জোর ক'রেই বলবো যে গদ্যে কি পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব ও প্রধান **গুণই** এই, তারা মুখর; নদীব স্রোত যেমন মুখর, হাওয়ায় যেমন মুখর অরণ্য। রবীন্দ্র-কাব্যকে 'সংহত ও সংযত' বলা অতি নির্বোধ চাটুবাক্য, কেননা 'সংহত ও সংযত' হওয়াই যে কাব্যের একমাত্র মহিমা তা তো নয়। হুইটম্যানের কি স্যুইনবর্নের কি শেলির স্তুতি করতে গিয়ে কেউ কি তাঁদের 'সংযম ও সংহতি'র তারিফ করে? বরঞ্চ এঁদের—এবং রবীন্দ্রনাথের—রচনার বিশাল দুর্নিবার উচ্ছ্বাসই কোনো-কোনো রুচিতে হয়তো ঠিক সহ্য হয় না। মানসী থেকে আবম্ভ ক'রে বলাকা পর্য্যন্ত. তাবপব এই পরবর্ত্তী সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলি মনে-মনে ভেবে দেখুন : বার বাব এ-কথাই মনে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একবার বলতে আবম্ভ করলে সহজে আর থামতে পাবেন না, নিজের আবেগের ঝোঁকে কূল ছাড়িয়ে চ'লে যান বন্যার নদীর উচ্ছ্বাসে। অতি সূক্ষ্মভাবে দেখলে, এতে হয়তো তাঁর বিশেষ কোনো-কোনো কবিতাব ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু এ-জন্য রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেয়া আর তিনি রবীন্দ্রনাথ হ'লেন ব'লে তাঁকে দোষ দেয়া একই কথা। প্রত্যেক কবিকে তাঁর নিজের সর্ত্ত-অনুসারেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়; ব্যক্তিগত পছন্দমত কাটছাঁট কবতে গেলে হয়তো হাবাতে হয় কবির সারবস্তুকেই। সমগ্রভাবে না নিলে কোনো কবিকেই বোঝা যায় না ; যেটা কখনো-কখনো মনে হবে কবির দুর্বলতা, সেটাই যে তাঁব মহিমাবও উৎসস্থল. এ-কথা সমগ্রভাবে তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়।

'এই সকল নিকৃষ্টতম কবিদেরও অনেকেই যথেষ্ট উপভোগ্য কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবাল্য পুষ্ট হইয়াও এই সকল কবিতার সমাদরে বিদগ্ধজনের ব্যাঘাত ঘটে না।' কিন্তু, মুখর নয় ব'লে পত্রপুট শ্যামলীর তারিফ করেছেন যে-'সমালোচক' তিনি কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের, এমনকি 'নিকৃষ্টতর' কবিদেরও রচনা প'ড়ে বুঝেছেন কিনা সন্দেহ করি। দাস-মনোভাবের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল। কবিদের 'উৎকৃষ্টতা' মাপবার ফিতে তাঁদের পকেটেই থাকে যাঁরা নিকৃষ্টতম কবিও নন ; এবং এই ধরণের মূঢ় চাটুকারিতা রবীন্দ্রনাথকেই হাস্যকর করে, এটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ।

গদ্য-কবিতা অনেকেই এখনো বোঝেন না কি বুঝতে চান না ; এবং না বুঝে, কি ইচ্ছে ক'রে না বুঝে অনেক অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বলেন। এঁদের মধ্যে কারো মতামতে যদি সততা থাকে সেটা অশ্রদ্ধেয় নয়। গদ্য কবিতার উপর যদি কারো সত্যিকারের অবিশ্বাস থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের রচনা পর্য্যন্ত প্রসারিত না-হবার কোনো কারণ নেই। কেননা যে-জিনিসটাই মেকি, সেটা রবীন্দ্রনাথ লিখলেও মেকি—বিশেষ ক'রে বাঙলায় রবীন্দ্রনাথই যখন সেটা প্রথম চালালেন। আর যদি তাতে কিছু থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও যেমন আছে, অন্যান্য কি অন্য কোনো-কোনো কবিতেও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই 'সমালোচক' গদ্য-কবিতার বৈধ অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, এদিকে রবীন্দ্রনাথের নাম উঠলেই নমো হে নমো। প্রভুর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র জিভ দিয়ে কী-রকম লালা গড়াতে থাকে সে একটা দেখবার জিনিস। রীতিমত পাভলোভের কথা মনে করিয়ে দেয়। গদ্য-কবিতা কী-রকম হওয়া উচিত সেটা দেখাবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এ-সব কবিতা লিখেছেন এ-উক্তিও টেঁকসই না যেহেতু এই দৃষ্টান্ত দেখে অন্য যে-কেউ লিখলে সেটা তক্ষুনি 'কচুরিপানা' হবে, কেননা তার লেখক তো রবীন্দ্রনাথ নন। পত্রপুট শ্যামলী যে ভালো, এর তো আর কোনো কারণ নেই, একমাত্র কারণ এই যে লেখক রবীন্দ্রনাথ।

আমি নিজে গদ্য-কবিতায় অসংশয়েই আস্থাবান। সকলেই তা হবেন, এখন পর্য্যন্ত সেটা আশা করিনে, কিন্তু এই ধরণের কাপুরুষ কপটতা ও হাঁটু-ভাঙা স্তাবকতা দেখলে ধৈর্য্য থাকে না। বাঙলা কাব্যে এই গদ্য-কবিতার প্রতিষ্ঠা একদিন হবে সকল তর্কের অতীত, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য কালক্রমে এর নব-নব বিকাশ হবে নতুন কবিদের হাতে ; এখনই তো দেখা যাচ্ছে সকলের হাতে গদ্য-কবিতা এক স্বরে বাজছে না। শস্তা অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখে ভীত হবার কিছু নেই ; সেটা অনিবার্য্য ও অবজ্ঞেয়। গদ্য-কবিতা যে স্থায়ী ও মূল্যবান তার একটা প্রমাণ এই যে তার রচনাভঙ্গির প্রভাব পড়েছে আমাদের পদ্যের উপরেও। পদ্যের শক্ত, আত্ম-সচেতন, ইস্ত্রি-করা পোষাকি ভাবটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে, অনেক এগিয়ে এসেছে মুখের ভাষার দিকে। রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক পদ্যে এবং আধুনিক কবিদের পদ্যরচনায় এ-জিনিসটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার।

গদ্য-কবিতা ইংরিজিতে অনায়াসে মেনে নিতে পারি, কিন্তু বাঙলায় তাকে কিছুতেই আমল দেবো না, এটা আমাদের জাতিগত দাসত্বেরই একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিতে হবে। ভালো লাগা কি ভালো না-লাগা দিয়েই কথা ; ভালো যদি

লাগলো সেখানেই তো মিটলো তর্ক। কিন্তু অনেকে হয়তো সহজ ভালো লাগাকে জোর ক'রে ঠেকিয়ে রেখে তাত্ত্বিক তর্ক তোলেন, নাম নিয়ে ঝগড়া বাধান। শ্যামলীর অন্তর্গত 'শেষ পহরে' কি 'বঞ্চিত' যাঁর ভালো না লাগবে, কোনো কবিতাই বোধ হয় তাঁর ভালো লাগে না। এই ধরণের নাটকীয় কবিতা—আমাদের অতি-পরিচিত জীবনের ছোট-ছোট ছবি—গদ্য-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটা খুব বেশি ক'রেই এইদিকে। যেন জীবনের কত ছেঁড়া পাতা বিস্মৃতির হাওয়ায় উড়ে যেতে-যেতে কবির কল্পনায় আটক প'ড়ে গেছে। পুনশ্চ পরিশেষ উভয় গ্রন্থই এই জাতীয় রচনার ভাণ্ডার। পলাতকার মত সম্পূর্ণ ও নিটোল গল্প নয়; একটুখানি গল্পকে ঘিরে মস্ত উজ্জ্বল ভাবমণ্ডল। 'সম্ভাষণ' ও 'অকালঘুম' এ দুটি কবিতাও সেই জাতের। 'যাকে খুব জানি তাকেও সব জানিনে এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে', যেমন হঠাৎ চোখে পড়ে প্রিয়ার প্রসাধন কি দেখা যায় তাকে অসময়ে সকাল-বেলায় ঘুমোতে, এক-একটি আশ্চর্য্য মুহূর্তে যেন সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উন্মোচিত। এ ছাড়া, শ্যামলীব লিরিক জাতীয় কবিতাগুলোয় পড়েছে পড়ন্তবেলার রোদ্দুরের ঝিকিমিকি; সত্যি বলতে, পূরবী থেকে আবম্ভ ক'বে রবীন্দ্রনাথেব বেশিব ভাগ গীতিকবিতার মূল কথা হচ্ছে 'মনে পড়ে'।

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি···।

প্রশান্তি নেমেছে কবির চিত্তে, অতল অকূল প্রশান্তি, দীর্ঘ কবিজীবনের শেষ পুরস্কার। যেন বিকেলের আকাশেব বুকের মধ্যে একটি নিঃশব্দ গভীর দৃষ্টি পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে চ'লে যাচ্ছে;

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি;
এর মধ্যে ভালো নেই মন্দ নেই,
নিন্দা নেই খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,

আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি,—
জীবনস্রোতের উপরতলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবি পতঙ্গের মতো
সূর্য্যাস্তবেলার আকাশে
রঙীন ডানার খেলা শেষ করতে
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।

এই বিরতি, এই অপরূপ সোনালি অবসর কথা ক'য়ে উঠেছে নানা সুরে নানা পরিবেশে কবির সমস্ত আধুনিক কাব্যে। শ্যামলী এর ব্যতিক্রম নয়। 'আমি' কবিতায় 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্বে'র বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রঙিন ঐশ্বর্য্যকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। এ সমস্যা মুখ্যত আধুনিক। সকল প্রশ্ন তিনি এড়াতে চান, কিন্তু প্রশ্ন তাঁকে হানা দেবেই, যেহেতু তাঁর মন প্রশান্ত হ'লেও অসাড় নয়, অতীতের স্মৃতিমর্মরিত হ'লেও বর্ত্তমান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নয়। তাঁর মনীষার তীব্র সচেতনতা এখনো দেখা যাচ্ছে কত নতুন-নতুন কথায় ও উপমায়, কাব্যের কত নতুন প্রকাশভঙ্গিতে, কত নবাগত সমস্যার অঙ্গীকরণে। মন তাঁর অবিশ্রাম গতিশীল; গীতাঞ্জলির গভীর আত্মস্থতায় এখনো নিশ্চিন্ত থাকলে এ-প্রশ্ন তিনি করতেন না—

পণ্ডিত বলেছেন—

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।…
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর"
"আমি ভালোবাসি।"

বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
প্রলয়-সন্ধ্যায় জপ করবেন,—
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন, "বলো, আমি ভালোবাসি ?"

এ-ই তো প্রশ্ন। এবং এ-প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথের মুখেও আজ নেই।

বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ দাশ

আদিম দেবতারা

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিল রূপ—
কি ভয়াবহ নির্জ্জন রূপ তোমাকে দিল তারা ;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিল মাছির মত কামনা।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিল লিপি রচনা করবার আবেগ :
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
যেন নিশীথ দেবদারু দ্বীপ ;
কোনো দূর নির্জ্জন নীলাভ দ্বীপ যেন ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছ ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জ্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি!—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন,
পৃথিবীর সমস্ত রূপ একটা বিরাট তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত
একটা বীভৎস পাঙাশ সমুদ্রের উল্কায় উল্কায়
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

ছায়া দেবী

অনন্য

যেদিন তোমায় দেখেছিলাম,
মধুময় দিন ছিলো জীবনে।

সকালের মেঘ-ভাঙা
স্পর্শ-কোমল বর্ষার আলো

উদ্ভাসিত করেছিলো
তোমার মুখটি,
প্রতিভাসিত হয়েছিলো
সে আধো-আলো-আঁধারের মায়া
আমার মনের নিবিড় পরতে।

অপগত কতদিন
তবু তো মলিন হলো না—
সেই মেদুর আলো,
মনের মঞ্জুষায় তোলা আছে এখনো
সোনালী আখরে লেখা
স্মরণের গন্ধ ভারাতুর
ভূর্জ্জপত্রখানি।

এখন তুমি কতদূরে!
থাকবে কি শুধু পুঁথির পুঁজি?
উতল মনের বিরল স্তব্ধতায়
মর্ম্মরিয়ে উঠবে সেই বিজন স্মৃতি?

বুদ্ধদেব বসু

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে, এই পৃথিবীর।
একদিকে আমি, অন্যদিকে তোমার চোখ স্তব্ধ, নিবিড়;
মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।

আর এই পৃথিবীর মানুষ তাদের হাত বাড়িয়ে
লাল রেখা আঁকতে চায়, তোমার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে
জীবন্ত, বিষাক্ত সাপের মত তাদের হাত বাড়িয়ে।

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মত দোলে
তোমার দুই বুক ; কল্পনার গ্রন্থির মত খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর ; ঝড়ের পাখির মত দোলে

আমার হৃৎপিণ্ড ; আমরা ভয় করবো কা'কে ?
আমরা তো জানি কী আছে এই রাস্তার এর পরের বাঁকে—
সে তো তুমি—তুমি আর আমি ; আব কা'কে

আমরা দেখতে পাবো ? আমার চোখে তোমার দুই বুক
স্বর্গের স্বপ্নের মত ; তোমার বুকের উপব উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ ; কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক

আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
খরস্রোত ; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায় ; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

তীব্র আবর্ত্ত, যেখানে আমরা জয়ী, আমরা এক, আমি
আর তুমি—কী মধুব, কী অপরূপ-মধুর এই কথা—
তুমি—তুমি আর আমি ।

আফ্রিকা

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
আপনাতে স্রষ্টাব আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বারবাব নূতন সৃষ্টিবে
সেইদিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমাবে নিযেছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধবিত্রীব বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।

সেথায় অবণ্য-অন্তবালে
নিভৃতে গোপন অবকাশে
দুর্গমেব বিদ্যা তুমি কবেছ সঞ্চয
দিনে দিনে।
জলস্থল বাতাসেব
দুর্বোধ সঙ্কেত যত নিয়েছ চিনিযা।
প্রকৃতিব মাযা
ধবিতে শিখিতেছিলে আপন চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ কবিতেছিলে ভীষণেবে
আপনাবে কবিযা বিরূপ,
শঙ্কাবে মানাতে হাব
নিজেবে অর্পিতেছিলে বিভীষাব প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবেব দুন্দুভি নিনাদে।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনেব তলে
আছিল অপবিচিত তোমাব মানবরূপ
উপেক্ষাব আবিল দৃষ্টিতে।

এল তারা দলে দলে
তোমার শ্বাপদ হতে ক্রূরতর যারা,
এল তারা গর্বে যারা অন্ধ প্রায়
সূর্যহারা তোমার অরণ্য চেয়ে।
সেথা অন্ধকারে
সভ্যের বর্বর লোভ উলঙ্গ করিল আপনার
নির্লজ্জ দুর্মানুষতা।
অশ্রু তব রক্তসাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের বাষ্পাকুল পথ
ডুবাল পঙ্কের স্তরে।
দস্যুপদপাদুকার তলে
বীভৎস কর্দম
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।

সে মুহূর্তে তাদের পল্লীতে
মন্দিরে বাজিতেছিল দয়াময় দেবতার নামে
পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মার কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সঙ্গীতে
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যবে পশ্চিম দিগন্ত তলে
ঝঞ্ঝাঘাতে রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষু প্রদোষ,
গোপন গহ্বরচারী পশুর অশুভধ্বনি
দিনান্তের করিছে ঘোষণা,—
এসো যুগান্তের কবি,
অবসন্ন এ সন্ধ্যার শেষরশ্মিপাতে
নির্দয়দলিত ওই মানহারা মানবীর কাছে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো,
হোক্ তাহা তব সভ্যতার
হিংস্রপ্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী॥

জীবনানন্দ দাশ

সমারূঢ়

বরং নিজেই তুমি লেখনাক' একটি কবিতা
বলিলাম ম্লান হেসে ;—ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর
বুঝিলাম সে তো কবি নয়,—সে যে আরূঢ় ভণিতা
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
ব'সে আছে সিংহাসনে.—কবি নয়—অজর, অক্ষর

অধ্যাপক ;—দাঁত নাই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আব হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল ,—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি ।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায

স্বপ্ন

তোমার দু'টি নরম ভিজে চোখে
দেখি আমি স্বপ্ন :
পৃথিবীটা ছিল যখন কিশোর প্রাণের ইচ্ছাব মত অপরিণত:
যখন সেখানে বসন্ত আসে নি
তার উচ্ছৃঙ্খল বিলাস নিয়ে –
পলাশের,
আর ভেঙে-পড়া-ঊর্ম্মির মর্ম্মরে মুখরিত
দক্ষিণ বাতাসের ।

সৃষ্টির সেই সূচনায়
ছিল না কোনও ভাষা, কোনও প্রকাশ কোনও গান ।

শুধু বিকাশের অসহ উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠ্‌ত কেঁপে, বাতাস উঠ্‌ত কেঁপে,
আর সেই কম্পনের গান রিন্‌রিন্‌ ক'রে' উঠ্‌ত
প্রতিধ্বনিত হত আলো আর উত্তাপে।

তোমার দু'টি ভিজে চোখে
দেখি সেই ধূসর অতীতের স্বপ্ন,
আর সেই অসহ কম্পন।

নতুন কবিতা

ক্রন্দসী—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী ভবন। একটাকা বারো আনা।

আধুনিক বাঙালির কাব্যসাধনার বিশেষ একটা দিক ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কয়েকজন সজীব ও সক্রিয় কবি আছেন, যাঁদের প্রচেষ্টা বলশালী উচ্চারণের দিকে, কঠিন উজ্জ্বলতার দিকে, এবং আঙ্গিক কৌশল যাঁদের শব্দপ্রয়োগে মিতব্যয়িতা ও অব্যর্থ নৈপুণ্য। এঁদের ছন্দও তাই কানে-কানে-টানা ধনুকের ছিলার মতো টান, কোনোখানে একটু ঢিলে হবার উপায় নেই। মাথা খাটিয়ে এঁরা কবিতা লেখেন, এবং সেই শ্রম ধরা পড়লে লজ্জিত হন না। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম, তথ্যবহ ও শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষ এবং সর্বোপরি নানা অ-বাঙলা সংস্কৃত শব্দে ও পরিভাষায় আকীর্ণ করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন, রচনাবিন্যাসের অন্যমনস্কতার কোনো প্রশ্রয় নেই এঁদের কাছে।

এই শ্রেণীর কবির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে—এবং সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনার কঠিন উজ্জ্বলতা আমার ভালো লাগে—যদিও স্বীকার করবো কখনো এঁদের কোনো-কোনো কবিতা ভালো বুঝতে পারিনে। শক্ত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে নানা পুঁথিপত্র অভিধান ঘাঁটলে তবে হয়তো এই জাতের কবিতা সম্পূর্ণ বোঝা যায়; কিন্তু সেই ধরণের 'বোঝা'র উপর আমার বিশেষ আস্থা নেই। সত্যি বলতে, কবিতা 'বোঝা'টাই যে সমস্ত কথা—এমন কি মস্ত কথা—তাও আমি মানতে ইচ্ছুক নই। কোনো কবিতায় শুধু ছন্দের দোলাটাই হয়তো উপভোগ করি; কোনো কবিতা বিশেষ একটা উপমা কি রূপক-ব্যঞ্জনার জন্যেই

মূল্যবান মনে হয় ; কোনো কবিতার দুটো লাইন হঠাৎ মনের মধ্যে এমনভাবে গাঁথা হ'য়ে যায় যে পথে চলতে-চলতে হঠাৎ নিজেকে তা গুনগুন করতে শুনি। তখনই বুঝতে পারি সে-কবিতায় কিছু খাঁটি জিনিস আছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও আমার উপভোগের মধ্যে বরাবর একটা ব্যবধান দেখতে পেয়েছি। তাঁর কবিত্বশক্তিকে স্বীকার ও সম্মান না-করা অসম্ভব ; কিন্তু আমার উপভোগটা প্রায়ই হয়েছে অসম্পূর্ণ। প্রথম কথা, আমি ভালো সংস্কৃত জানিনে ; অনেক শব্দ আমার মনে কোনো প্রতিধ্বনি জাগায় না ; তা ছাড়া, অনেক সূক্ষ্ম ও সুদূর উল্লেখ আমার অজ্ঞতার জন্যেই আমার কাছে অর্থহীন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক সহানুভূতির অভাব, তাঁর ও আমার মেজাজে মিল নেই। তবু এ-কথা বলতেই হবে যে যখনই তাঁর কবিতা পড়ি তখনই মনে-মনে প্রশংসা না-ক'রে পারিনে। 'অর্কেস্ট্রা'র আঙ্গিক অভিনবত্বে, ছন্দের দুঃসাহসী কৃতিত্বে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। 'ক্রন্দসী'তে আরো খানিকটা পরিণতি পাওয়া গেলো।

পরিণতিটা বিষয়বস্তুর। কবি বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী, পৃথিবীর মায়ায় বিমুখ, পরমের সন্ধানী। অনেকগুলি কবিতাতেই আছে নিষ্ঠুর আত্মপরীক্ষা। 'প্রার্থনা' 'প্রশ্ন' 'অকৃতজ্ঞ' এ-সমস্ত কবিতায় স্থাপিত সমাজবিধি ও সংস্কারের আরাম আশ্রয়ের উপর তিনি প্রগতির বিদ্রূপের কশা চালিয়েছেন। খুঁটে-খুঁটে দেখেছেন নিজের জীবনের ব্যর্থতা। মায়াবী জীবন অতি তুচ্ছ জিনিস দিয়ে তাঁকে ঠকাচ্ছে।

> সামান্যাদের সোহাগ খরিদ করে
> চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে। ('জাতিস্মর')

সিনেমা থেকে বেরোতে ভিড়ের মধ্যে 'চির অপরিচিতা' দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো—

> শুধু তুমি অন্তর্হিত ; ভ্রষ্ট লগ্ন ; সমাপ্ত সুযোগ।
> আবার নিষ্ফল হলো আজন্মের বিরাট উদ্যোগ॥ ('সিনেমায়')

তাঁর উপলব্ধির শেষ কথা এই—

> জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
> নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
> শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
> মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
> সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ; ('নরক')

কবির মধ্যে একটা অস্থিরতা এসেছে। এই কবিতাগুলি সন্ধানের। কিসের সন্ধান? নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, আবেগবর্ণহীন প্রস্তাব। তাঁর আদর্শ সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকতা, জীবনের সুখ দুঃখ ভয় আশার অতীতে এক 'অনাম চিরসত্তা'।

জীবনগণিকা
ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি প্রসাধনে ঢেকে,
সার্ব্বজন্য অভিসারে ডেকে
ভুলাবে কি পুনর্ব্বার আত্মহারা পুরাণপুরুষে? ('প্রত্যাখ্যান')

জীবন নানা রঙের নানা ছলনায় ভোলায় ব'লে তাকে তিনি ঘৃণা করেন কিন্তু তাঁর অভীষ্টও সিদ্ধ হয় না। 'নিগু'ণ নির্ব্বাণে'র অবস্থায় মনে হয় কখনোই বুঝি পৌঁছনো যাবে না। এক জায়গায় গভীর বিতৃষ্ণায় তিনি স্বীকার করেন—

নাই নাই মৌন নাই, সর্ব্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ,
নির্ব্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জলন্ত হৃদয়;
কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ, নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন,
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা, সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা। ('সৃষ্টিরহস্য')

অর্থাৎ, সৃষ্টিটা যে চলছে সেটা জলন্ত হৃদয়ের বাসনার জোরেই, নিরাসক্ত শ্বেত বুদ্ধির জোরে নয়। ব্যর্থতা ও হতাশা তাই কবির নিজের ভাগ্য ব'লে মেনে নিয়েছেন।

আদর্শ হিসেবে এটা আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। এই বুদ্ধিজনিত বৈরাগ্যের সমাপ্তি বন্ধ্যা ধূসরতায়, এই আমার বিশ্বাস। কবির পক্ষে এটা বড়োই বেমানান। জীবনের সমস্ত উপঢৌকন ত্যাগ ক'রে কবি কোথায় পৌঁছলেন? কোনোখানেই না। —কী পেলেন তার বদলে? কিছুই না। কী তাঁর দেবার আছে? কিছুই না এই পৃথিবীতে আমাদের বিচিত্র জীবন-লীলার নানা কোণে-ঘুপচিতে, নানা আবছায়ায়, নানা আঁকাবাঁকায় ও ইঙ্গিতে আলো ফেলবেন যে কবি, যে-কবি জীবনকে দেখবেন ও দেখাবেন, জীবনকে ভালোবাসতে শেখাবেন, ভালো ক'রে, আরো ভালো ক'রে বাঁচতে শেখাবেন, সামাজিক দিক থেকে সেই কবির রচনাই সব চেয়ে সার্থক। আমরা কবির কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিতে চাই, যে-শক্তিশালী কবি সেটা দেন না, জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তাকে অভিযুক্ত করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে।

একটা কথা মনে হয়: সুধীন্দ্রনাথ কি এ-জীবনের কথা কখনোই কিছু বলবেন না, যেখানে আছে ফুল, আছে শিশু, আছে বৃষ্টি আর রোদ; আছে হঠাৎ খুশি

হওয়া ; আছে মানুষের আশা, চেষ্টা, জয়োল্লাস, আছে ক্লান্তি ও পরাজয়, আছে দুঃখ ও মৃত্যু। এটা কেমন ক'রে হলো যে এই অপরূপ চিরন্তন রহস্যের মধ্যে তিনি শুধু কালের নির্মম ধ্বংসকেই দেখতে পেলেন, নিছক মৃত্যুকে, আর দেখলেন বিশুদ্ধ জৈবধর্মমাফিক 'আলিঙ্গন—পুনরালিঙ্গন' ! সুধীন্দ্রনাথের রচনায় এমন কোনো উপমা কি রূপক-মূর্তি নেই যা আমাদের চির-পরিচিত কোনো অভিজ্ঞতাকে নতুন ও চিরন্তন ক'রে সৃষ্টি করে ; এমন কোনো বিচ্ছিন্ন পংক্তি মগজে এসে লাগে না যার ধাক্কায় সহস্র অস্পষ্ট ও অচেতন স্মৃতি মর্মরিত হ'য়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন : 'আমার আনন্দ বাক্যে।' কথাটা সত্য। কিন্তু যে-অপূর্ব জাদুতে কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে, যাতে কয়েকটি কথার সংযোজনায় জীবনের কোনো গূঢ়প্রদেশ উদ্ভাসিত হয়, সেটা তাঁর মধ্যে নেই। কথাকে তিনি ব্যবহার করেন মিস্ত্রি যেমন ক'রে ইঁট ব্যবহার করে, অতি সাবধানে কথার পর কথা সাজিয়ে তিনি কবিতা গঠন করেন, তাঁর মন তার্কিকের, তাত্ত্বিকের, তাঁর কবিতা ঠিক যতটুকু বলে তার বেশি বলে না, কবিতা শেষ হ'য়ে যাওয়ার পরে ইঙ্গিতের অনুরাগ কিছু থাকে না। গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরণটা তিনি কবিতায় আরোপ করেছেন। সেইজন্য, যদিও দেখতে দুর্বোধ্য, শব্দার্থ ও উল্লেখগুলো আবিষ্কার ক'রে নিয়ে আস্তে-আস্তে পড়লে তাঁর কবিতা খুবই সহজ, আমার মনে হয় অত্যন্তই বেশি সহজ। দর্শনের কোনো যুক্তির মতোই তাঁর কবিতাকে অনুসরণ করা যায় : ঠিক যেখানে শেষ হ'লো, সেখানেই ফুরোলো, আর-কিছু নেই। প্রতিটি কবিতার 'অর্থ' অতি স্পষ্ট সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথ কুশলী নির্মাতা, তাঁর কবিতা একেবারে নীরন্ধ্র শক্ত, যাকে বলা যেতে পারে সলিড। ছন্দে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা ; আঠারো মাত্রার পয়ারে আট-দশ-এর নিখুঁত ভারসাম্য আলেকজাণ্ডার পোপের কথা মনে করিয়ে দেয় :

> মেঘার্ত পাণ্ডুর শশী ; শঙ্কাকুল শ্রাবণশর্ব্বরী ;
> নিঃস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী ('কুক্কুট')

চতুর অনুপ্রাসে, ব্যঞ্জনবর্ণের ঠাসবুনোনে তুচ্ছ বিষয়কেও ধ্বনির কল্লোলে গম্ভীর ক'রে তোলবার কৌশল তাঁর জানা আছে :

> ডাহুক, সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল
> নির্ব্বিঘ্ন তিব্বতপানে নিরুদ্দেশ আসন্ন দুর্দিনে।
> চক্রচর চর্ম্মচটী লুক্কায়িত দুশ্চর বিপিনে,
> প্রেতসঞ্চরিত কক্ষে চিত্রার্পিত সারিকা বাচাল। ('কুক্কুট')

'ক্ষতির সহিত ক্ষতি, অপচয়সনে অপচয়', এ-রকম দুর্বল লাইন 'ক্রন্দসী'তে আর বোধ হয় পাওয়া যাবে না, পয়ারের উপর সত্যি তাঁর নিখুঁত দখল। এ-বইয়ের যে-কবিতাগুলো বিশেষরকম ভালো, যেমন 'প্রার্থনা', 'প্রশ্ন', 'মৃত্যু', 'ভাগ্যগণনা', 'নরক', 'প্রত্যাখ্যান', সবই অসমমাত্রার পয়ারে লেখা, ঝোঁকটা নাটকীয় উক্তির। ছন্দের গতি অবাধ ও মন্থর, স্বচ্ছন্দ ও গম্ভীর। কিন্তু কয়েকটি পংক্তি সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানিয়ে রাখছি :

জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভীড়ে ('মৃত্যু')
হিরণ্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে ('পরাবর্ত্ত')
অসূর্য্যম্পশ্যরূপা পরাণপ্রিয়ার ('প্রশ্ন')

আমার মতে এ-সমস্ত লাইন নিশ্চয়ই ছন্দপতন।

তিনমাত্রার ছন্দেও কবির হাত খুব ভালো :

বর্ব্বর বায়ু চিরায়ু অচলচূড়ে ('জাতিস্মর')
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি ('উটপাখী')

এত ভালো লাইন একজনের কাছ থেকে খুব বেশি আশা করা যায় না। তিন মাত্রার ছন্দে লেখা তাঁর 'জন্মান্তর' কবিতা ('কবিতা' : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) এ-বইয়ে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। কী কারণে সুধীন্দ্রনাথ ও-কবিতা বাদ দিয়েছেন জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় বাদ দিয়ে 'ক্রন্দসী'কে ততটুকু দরিদ্র করেছেন।

ছন্দের প্রসঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে যে ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ সুধীন্দ্রনাথের একেবারেই আসে না, এবং কেন যে তিনি তাতে লিখেছেন সেটাই আমার আশ্চর্য মনে হয়। অমন চমৎকার পয়ারের পাশে—

সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলা বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা। ('বিরাম')

ছিলো নাকো অন্তরে আর আশা,
দুঃস্থ মাথার চিন্তাগুলো কণ্ঠে খুঁজে পাচ্ছিলো না ভাষা।
হচ্ছিলো বোধ অবুঝ হৃদয়খানা ('বর্ষশেষ')

এরকম দুর্বল মেরুদণ্ডহীন পংক্তি সুধীন্দ্রনাথের মতো সতর্ক ও সচেতন কবি কেমন ক'রে মুদ্রিত করতে পারলেন! যে-কবি এমন ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেন—

হয়তো একদা সেথা মণিময় অমারজনীতে
পাবি, কবি, অকস্মাৎ অজানিত দয়িতের সাড়া। ('পরাবর্ত্ত')

কবি এমন ছবি আঁকতে পারেন—

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়স্ফীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হ'য়ে সঙ্গীহাবা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্ম্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায়ে আমার কাঁধে, পরণের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সঙ্কীর্ণ কুটীবে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোব জাতিস্মর অবচেতনায়। ('নরক')

তিনি শুধু শক্তিমান নন, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, ও সেই শক্তির উপব সম্পূর্ণ অধিকারও অর্জন করেছেন। তাঁর পক্ষে ঐ ভাঙা-ভাঙা ছন্দে বেচাল হ'য়ে পড়াটা বড়োই শোচনীয়।

এ-কথা ব'লে এ-আলোচনা শেষ কববো। যে বাঙলা কবিতার নতুন পরিণতিব ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথকে একজন প্রধান কর্মী বলে মেনে নিতে এখন আর বাধা নেই। তিনি সক্রিয়, তিনি পরিণতিশীল, তিনি আন্তবিক পরিশ্রমী। তাঁব কবিতা ভালো ক'রে পড়বার ও বিশেষরকম আলোচনাব যোগ্য, তাঁর নির্মাণের কলাকৌশল, তাঁর জমাট ও জমকালো গঠনভঙ্গি আমাদের এই অতি শিথিল অতি তরল রচনার দেশে সত্যই মূল্যবান। নিশ্চয়ই তিনি এখানেই থামবেন না, নিশ্চয়ই তাঁর কবিত্বশক্তিব বিবর্তনে একদিন তাঁর 'ভগ্ন বৃত্ত পূর্ণ' হবে; তাঁর অন্তরের এই ব্যর্থতার গ্লানিমা কেটে গিয়ে জ্ব'লে উঠবে নতুন আশা ও উদ্দীপনার আলো।

বুদ্ধদেব বসু

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্য্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে।
পূর্ণ হোক্ কাল।
স্থূলোদর লোলজিহ্বা লোভ
আত্মস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক পূর্ণ হোক।
করো,
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক
তার জয়ধ্বনি করো।
উন্মত্ত কামার্ত্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে
বিদ্যুৎ-চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।

হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীব পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো।
জয়ধ্বনি করো।

নতুন কবিতা

কঙ্কাবতী—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-ভবন, দুই টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য। এসব কবিতা পড়তে বসে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এসবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের থেকে সৌন্দর্য্য ঝ'রে প'ড়ে এসব কবিতায়, কঙ্কালমুণ্ডের টিটকারি উড়ছে না কেন—এ-রকম সব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর ব'লে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্রোহ আমাদের জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকলেও সেটা মানবাত্মার পক্ষে ব্যর্থতারই জিনিষ; এবং যেখানে বিদ্রোহের ততটা অবসর নেই সেখানেও কি জোর ক'রে বিদ্রোহ আনতে হবে? শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধনা—এমন কি শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাধনা কি তা নয় যা বহুর স্খলন এবং ক্ষরণ এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জ্যামিতির—এবং যেখানে কোনো মহত্তর জ্যামিতি আর জ্যামিতি নয় শুধু—সমন্বয় ও সৌন্দর্য্য খুঁজে নিতে পারে? আমরা স্বীকার ক'রে নেব যে 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য, এবং প্রেমের কবিতাগুলো এই বইয়ের ভিতর কতদূর কবিতা হয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক জিনিষ হয়েছে তাই নিয়ে এই কাব্যের বিচার। অন্য নানারকম কবিতার মত প্রেমের কবিতার আবির্ভাব হয়েছে বিভিন্নরকম ব্যাপকতা, গভীরতা, শূন্যতা বা অন্ধকার নিয়ে। বুদ্ধদেবের এই সব প্রেমের কবিতার ভিতর কোথাও নিরালম্ব শূন্যতা, শববাহকদের গুমোট নিস্তব্ধতা বা নিষ্ক্রিয় অন্ধকারের বিভীষিকা নেই; কিংবা শাদা সূর্য্যের আলোও হাড় আর কড়িও হাড় ব'লে মনে হয় যে-দেশে, সে-প্রদেশ নেই এখানে। তা নাই বা রইল, এই বইটি হ'ল কবিতারাজ্যের আর একটা facet। এই কবিতাগুলোর মধ্যে

তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জীবন চারদিককার প্রকৃতির রস ও প্রেমাস্পদার সৌন্দর্য্যের ভিতর নিজেকে গহন ক'রে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের চলতি পথের ওপারে কোনো ধূসর প্রাসাদের মত যেন: যেখানে অন্ধকার সিঁড়ি রয়েছে, রয়েছে রূপ ও কামনার আরশী, জানালায় রঙীন কাঁচ, বাইরে আধো আঁধার, ধূ ধূ শাদা পথ, ঝাপসা ছায়ার ঝিকিরমিকির আলো, হাওয়ার বেহালা, সোনা ও তামার মত চাঁদ, এবং যেখানে বেহালার বুকে নাম ফোটে কঙ্কাবতী—কঙ্কাবতী! বিচিত্রতর মনে হবে ব্রাউনিঙের কডেল লেডি অব ট্রিপলিকে যে সুরে ডেকেছেন। কিন্তু সেই কবিতার পর 'কঙ্কাবতী'র সুর বিচিত্রতর মনে হবে।

কঙ্কাবতী-জড়িত কবিতাগুলোর কথা পরে বলব। 'কখনো' কবিতায় রয়েছে:

আমি তো দেখেছি তারে—হ'লোই বা শুধু একবার।
সোনার ঢেউয়ের মত তার সেই কেশের উচ্ছ্বাস,
টলটলে আলো চোখে—ঢেউয়েতে দীপের ছায়া সম,
আমি তো দেখেছি তারে--আঁখি যবে তারা হয়ে ফোটে,
কত তারা—যারা দেখে নাই!

কিংবা 'বেহায়া' কবিতায়:

কহিলাম আয়নার অচেনা মেয়েকে,
আসিবে না এ তো জানা কথা!
এইবার এই খেলা দাও তবে রেখে—
সখ ছিলো মিটিয়াছে তো তা!
অবনত হয়ে আসে মেয়েটির চোখ
মুকুরে ঠিকরি পড়ে তারার আলোক।

এই লাইন ক'টির ভিতর এমন একটি সহজ স্বাদ রয়েছে যা কোনো অলঙ্কার বা জমকালো শব্দ-যোজনার অপেক্ষা রাখে না।

প্রেয়সীর 'চুল' এর উপর কবিতা লিখেছেন তিনি। রূপসীর চুল নিয়ে কবিতা লেখা চলে যা কাব্যসাহিত্যে ক্লাসিক হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু এ কবিতাটি সে অমরতার দাবী করতে পারে ব'লে মনে হয় না। কবি লিখেছেন:

এখনো সিন্ধুর বুকে ঘুম যায় সন্ধ্যার ছায়ারা
এখনো রয়েছে রাত্রি অরণ্যের চরণে জড়ায়ে;

আমার চোখের 'পরে সৃষ্টি করো রাত্রির তিমির,
আমার দৃষ্টির 'পরে ঢেলে দাও ঠাণ্ডা অন্ধকার ;
চুলগুলি খুলে দাও, খুলে দাও, ঢেলে দাও মোর
নয়নে আঢুল।

কবিতাটির ভিতর এ কয়টি লাইন এবং পরে তিন চারটি লাইন আমার বরং ভালো লাগল ; কিন্তু আমার মনে হয় এর চেয়ে নিবিড়তর স্পর্শ দেওয়া যেতে পারত।

'একখানা হাত' কবিতাটির ভিতর কবি আবার সেই রোমাঞ্চের জন্ম দিয়েছেন যা কখনো আমাদের অন্ধকার অরণ্যে, জনহীন মধ্যসমুদ্রের ভিতর কিংবা মানুষের মনেরই ভিতর রক্তমাংসরম্য অথচ যেন মাংসহীন কোন্ রূপের আকৃতির ভিতর নিয়ে যায়।—আকাশে মেঘ জমেছে, পথ নিরিবিলি ; সব চুপ ; রাত দুপহর। পথের মোড়ে একটি বাড়ির নিচের ঘরে জানালায় আলো জলছে ; কাছে এসে চোখ তুলে তাকাতেই জানালা বুজে গেল :

নিলাম তাহারি ফাঁকে পলকের তরে
একখানা সাদা হাত দেখে,
দুইটি কবাট এসে বুজিলো তখন
দুই দিক থেকে।···
আবার দুচোখ ভ'রে ঘুম জমে এলো
সকল পৃথিবী অন্ধকার,
এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতখানা কার।···
বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারায়েছে,
না জানি এখন কত রাত ;
—কখনো সে হাত যদি ছুঁই, জানিবো না
এই সেই হাত।

এই কবিতাটি বাস্তবিক যা নয়—লঘু মুহূর্তে একে সেই তুচ্ছ জিনিষ ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতা তো লঘু মুহূর্ত নিয়ে নয়। যেই আবহাওয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে আমরা পরিচিত মুখকে পরিচিত মুখ বলে চিনি, সেই স্বপ্নের ধ্যান আবার যদি আমাদের চোখে জ'মে ওঠে তাহলে একখানা অচিহ্নিতপূর্ব্ব, অপরিচিত শাদা হাত, যা চিরকাল অপরিচিত থাকবে, তা আমাদের স্বাভাবিক জগতের ঘুমকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে পারে।

আরশি, সেরিনাড ও কঙ্কাবতী এই কবিতা তিনটি কঙ্কাবতীর উদ্দেশে। এই কবিতা ক'টির ভিতর থেকে কোনো স্ট্যাঞ্জা ছিঁড়ে বার ক'রে সে-সবের সৌন্দর্য্য দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ এ কবিতাগুলোর সৌন্দর্য্য এদের ব্যাপ্ত প্রসারের সমগ্রতার ভিতর, স্বপ্নের ভিতর, আবেগের ভিতর, এবং এবকম আবেগময়ী রূপসী রূপ এর নিজের আভ্রাণ নিয়ে বাংলা কবিতায় অনন্যসাধারণ। এসব কবিতা বাংলা কাব্যকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। এগুলো বুদ্ধদেবের পুরোনো সৃষ্টি; কিন্তু অনাসৃষ্টির নিষ্পেষণ নেই ব'লে নতুনের আস্বাদ এদের দেহ থেকে ঝ'রে পড়বে না কোনোদিন। আমার বুদ্ধির সতর্কীকরণ সত্ত্বেও হৃদয়ের আবেগে কয়েকটি স্ট্যাঞ্জা না খসিয়ে তৃপ্তি বোধ করছি না। এগুলো যেন কোনো কুহকময় অফুরন্ত প্রেমের জয়জয়ন্তী। বাঙালীর ও পৃথিবীর কাব্যের প্রেম ও কামনার অনেক অন্ধকারময় রজনী থিতিয়ে যেন এদের আবির্ভাব :

বেহায়া বেহালা কী কথা যে বলে, শুনতে পাও!
কঙ্কাবতী!
'ধু-ধু সাদা পথ তোমাব আশায় হ'লো উধাও
কঙ্কাবতী!
ধু-ধু সাদা পথ,—সুদূব বিদেশ শেষের মোড়ে
সেখানে তোমাকে কেউ চেনে নাকো চেনে না মোরে,
কঙ্কা চলো;
যেখানে তারারা সারারাত ভ'রে—আকাশ ভ'রে!
সারাবাত ভ'রে হাহাকার কবে বাউল বাও
কঙ্কা গো!
কঙ্কা, শয়ন ছাড়ো গো, নয়ন মেলিয়া চাও
কঙ্কা, জাগো,
কঙ্কা গো!' ('সেরিনাড')

কিংবা

লোকের চোখেব অতীত স্বপ্নে তোমাব নামের স্বপ্ন বুনি,
(কঙ্কাবতী!)
গূঢ় গভীর মন্দির মাঝে ঘণ্টার মত সুগম্ভীব
পলকে পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে—'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
আমার মনের গুহার বুকে।

আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায় চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্তত—
দশদিক থেকে কথা ক'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনি :
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢকণ্ঠ প্রতিধ্বনি
আমার মনের অপার আকাশে হাজার হাজার প্রতিধ্বনি :
ডাহিনে ও বামে উপরে ও নিচে, এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি !
কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী গো—কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী
এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি ! ('কঙ্কাবতী')

অথবা নিচে উদ্ধৃত স্ট্যাঞ্জাটির আরো গাঢ় সৌন্দর্য্য :

আকাশ কোমল, আকাশ কালো।
কোমল-কালো সে আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা একশো কোটি
আলোর পাখার আড়ালে তাকায়, আবার লুকায়, তাকায় হঠাৎ,
আবার লুকায় আলোর পাখার আড়াল টেনে।
আমি মনে ভাবি, তোমার নামের শব্দের সুর ওরাও জানে,
সেই সুরে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচে, দূরে আর কাছে বেড়ায় উড়ে—
ঝিকমিক !
সেই সুরে ওরা কখনো তাকায়, কখনো লুকায়, তাকায় আবার
মিটমিট !

এবং তারপর এই অপরূপ লাইন কয়টি :

আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তারার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মতন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো ! কঙ্কাবতী গো ! কঙ্কাবতী !
তারার মতন একশো কোটি ! ('কঙ্কাবতী')

বইটির কোনো-কোনো কবিতায় পুনরুক্তি বেশী, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা প'ড়ে পাখা মেলতে পারেনি। কোনো-কোনো কবিতায় জায়গায় জায়গায় লঘু আমোদের ছোঁয়াচ রয়েছে, কিংবা একেবারে মুখের ভাষায় প্রতিদিনকার জীবনের নানারকম ভাঁজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা আছে। কবিতায় সরল মৌখিক ভাষার এ-রকম ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে শুরু হয়েছে

ব লে মনে হয়, এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় protagonist। কিন্তু এ চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে ব'লে মনে হয় না। 'মধ্যবর্ত্তী', 'কোনো মেয়ের প্রতি', 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি' ঠিক কবিতা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। জীবনের ঠিক এই রকম শাদা খুঁটিনাটি ব্যাপার মৌখিক সোজা ভাষায় ফুটিয়ে কবিতায় রূপায়িত করবার মত প্রশংসনীয় শক্তির আস্বাদ পেলাম কঙ্কাবতীর' ভিতর। আমার মনে হয় এদিকে আরো পরীক্ষা ক'রে দেখবার অবসর আছে এবং বুদ্ধদেব নিজেও তা করতে পারেন। যদি প্রশস্ততর ভাবে সফল হন বাংলা কবিতায় একটা নতুন জিনিষ দিতে পারবেন।

এইসব কবিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে গভীর এবং পৃথিবীর সীমান্তে যেন কোনো শেষ শতাব্দীতে 'তিমির-তোরণে চাঁদের চূড়া' এবং 'আঁধার-জোয়ারে জোনাকীর মত তারকা-কণা' নিয়ে, আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য সে যা-কিছু নিয়ে আসতে পারে তারই স্বপ্ন দেখে সময়সীমানাহীন 'শেষের রাত্রি'। আধুনিক বাংলাকাব্যে বুদ্ধদেব যে একজন প্রথমশ্রেণীর কবি একমাত্র এই কবিতাটির উপরেও সে সত্য নির্ভর করতে পারত। এই কবিতাটিও কঙ্কাবতীকে নিয়ে, এবং কঙ্কাবতী সম্পর্কে বাকী তিনটি কবিতার চেয়ে কল্পনার প্রসার ও আবেগের গভীরতায় গাঢ়তর যেন—অবশ্য মহান। হিউগো যাকে বলেছিলেন immensité এই কবিতাটির ভিতর তারি গভীর প্রতিধ্বনি।

> যেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা,
> হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগন্তে ভ'রে উন্মাদনা,
> কোটি সূর্য্যের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপটে পাখা।
>
> (কোটি-কোটি মৃত সূর্য্যের মতো অন্ধকার
> তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ ভার,
> এসো চ'লে এসো, মোর হাতে হাতে দাও তোমার—
> কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)
>
> তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
> আদিম রাতের আঁধার-বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জ ফুঁড়ে
> সময় ছাড়ায়ে,—মরণ মাড়ায়ে,—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
>
> (এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
> সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।

সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

Longinus বলেছিলেন, কবি আমাদের আনন্দই দেয় না—আমাদের হৃদয়ে আনে উন্মাদনা; এবং যে-সব শব্দ কবি ব্যবহার করেন সেগুলো 'very light of the spirit'—'শেষের রাত্রি' প'ড়ে তা উপলব্ধি করতে পারলাম আবার।

যাঁরা বলেন 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুলো আধুনিক সময়ের উপযোগী নয়—তাঁরা সময় বা আধুনিক সময় বলতে কোনো একটা কৃত্রিম কিছু তৈরি ক'রে নিয়েছেন। 'একখানা হাত' চিরকালই একখানা হাতের রহস্য; 'অন্ধকার সিঁড়ি' আজকের কোনো এক্স-রের আলোতেই অন্ধকার সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠবে না—এবং সেইজন্যই তা সবসময়ের। 'শেষের রাত্রি' আদিম-রাত্রেও ছিল—রয়েছে বর্ত্তমানতম রাত্রির ভিতরে—এবং ভবিষ্যৎ কোনো রাত্রির ভিতরেই তা ফুরাবে না: অতএব সমসাময়িকতাহীন হয়েও তা সমস্ত কালেরই সমসাময়িক। যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না হ'লে দেখতে পারবেন না ব'লে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না—মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোনো একটা তুচ্ছতম দিককে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিক ব'লেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ;—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোনো কোনো মানুষের মন এককণা বালির ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভিতর, হাতের তেলোর ভিতরেই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভিতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায়। আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন;—'কঙ্কাবতী' সেই কাব্য যার ভিতর এই আস্বাদ পেয়ে জলকে ততটা ইন্দ্রজাল ব'লে মনে হয় না মানুষের হৃদয়ের তৃষিত হবার অনুভবকে যতটা। পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য পড়লে হৃদয়ে এই বোধ জন্মায়; হৃদয়ে এই অনুভব জন্মাতে পারেন যেই কবি (এবং তৃপ্তির অব্যর্থ পানীয় তিনি সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসেন) তাঁর কবিতাকে সময় ও মৃত্তিকা এসে কখনও ক্ষয় করতে পারে না। সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী' মৃত্তিকা-ও-সময়োত্তর কাব্য। কবিতার ভিতরে এই প্রথম ও শেষ নিদর্শন না পেলে তাকে পিপাসাহীন শরীরের নিকট এক গ্লাস ব'লে মনে হয় শুধু

বুদ্ধদেব বসুর কবিহৃদয়ের আভার থেকে 'কঙ্কাবতী'র জন্ম হয়েছে। বুদ্ধদেব অনেকদিন থেকে কবিতা লিখছেন। কঙ্কাবতী ছাড়া কবিতার বই আগেও আরো

প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু এই বইটির ভিতরেও নিহিত রইল তাঁর কবিযশ ; এর রস পান ক'রে বুঝতে পারলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রধান কবি ; প্রধানদের ভিতর অন্যতম : তাঁর 'কঙ্কাবতী' অবশ্যম্ভাবী পিপাসা জাগিয়ে গভীর পরিতৃপ্তি-কুহক নিয়ে এসেছে।

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ

কবিতার কথা

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা র'য়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত নয় ; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে ? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের নিকট থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহ'লে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেল্লাম। হয়তো সেই হীরের ছুরি পরীদেশের, কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন নতুন আবর্ত্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য্য গিঁটকে—আমি যতদূর ধারণা করতে পারছি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি—কিংবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবার মত কোনো সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কিনা—এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলব না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্ত্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকাররূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তাদের এ দাবীর সম্পূর্ণ মর্ম্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও

এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্য্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি ক'রে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্য-শরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা-খচিত - অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা' হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহ'লে কবিতা সৃষ্ট হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দ্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত ক'রে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলাজলের মৃষিকাঞ্জলির ভিতর শালিখের মত স্নান না ক'রে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মত; —সৌন্দর্য্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হ'লে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্য কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, ষড়্‌দর্শনের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলালের নিকট যাব না কেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকট না গিয়ে; দার্শনিক বার্গস'র কাছে যাওয়া উচিত, ইংলণ্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্ম্মীদের নিকট যাওয়া উচিত—ইয়েটসের কাব্যের নিকট, এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্যপ্রচেষ্টার নিকটেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি ক'রেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য ব'লে মনে হয়; কাব্যের ভিতর লোক-শিক্ষা ইত্যাদি অর্দ্ধনারীশ্বরের মত একাত্ম হ'য়ে থাকে না, ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্য্যের মত নয়; তাদের সৌন্দর্য্যকে সার্থক ক'রে, কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর গোপনভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মত যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্য্যের আভার মত রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধানভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যাঁরা একথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সৌন্দর্য্যের মতই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ—সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন—একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়—যাকে বলা হ'ল কাব্য (বা শিল্প)—যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে, যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্ম্মের আস্বাদেও যা পাই না—এর ধর্ম্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা' পাই না,—পৃথিবীর শতাব্দী-স্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্য সৃষ্টি করল)—কি ক'রে সেই বিচিত্রতার নিকট তার অনধিগত, অতিরিক্ত দাবী আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবী কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে ব'লে মনে করি তাহ'লে তার ন্যায্য ধর্ম্ম অভঙ্গুর নয় আর, তার বিশেষ স্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে দর্শনও তা' দিতে পারে, ধর্ম্মও তা দিতে পারে, সমাজসংস্কারক, জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন কি কর্ম্মীরাও তা' দিতে পারে। তাহ'লে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি কাব্যের নিজের ইনটিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। এবং এই প্রবন্ধের ভিতর আমার নিজের কথারই পুনরুক্তি ক'রে আমি বলব: 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি, কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' দর্শন বা সমাজসংস্কার বা মানুষের কর্ম্ম ও মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরণের সারবত্তা নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন ; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মত নয় ; যা উদ্‌ঘাটিত হ'ল তা' যে কোনো জঠরের থেকেই হোক্ আসবে সৌন্দর্য্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে ; যদি তা' না দেয় তাহ'লে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা' কবিতা হ'ল না, হ'ল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন—পুরোনোর ভিতরে সেই নূতন কিংবা সেই সজীব নূতন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্য্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে তাহ'লে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল ; আরো নানারকম মূল্য—যে সবের কথা আগে আমি বলেছি—তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মত ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টিস্থূলতাকে উঁচু মঠেব মত যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ব আমোদের আস্বাদ দিতে পারে ; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হ'য়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতাব প্রাচীন প্রদীপ—ততই নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষপরিবর্ত্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মত জ্বলতে থাকবে।

প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে—নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে ; কাব্যসৃষ্টির ভিতবে। আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে যেহেতু সে মনীষী কাজেই অর্থনীতি সম্বন্ধে—সমাজনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে মননরাজ্যের নানাবিভাগেই কবিব চিন্তার ধারা সিদ্ধ। আমাদের উপলব্ধি ক'রে নিতে হবে যে তা' নয়। উপকবির চিন্তার ধারা অবশ্য সব বিভাগেই সিদ্ধ—যেমন উপদার্শনিকেব। কিন্তু প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিংবা সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পী বানিয়েছে—বুদ্ধির সমীচীনতা নয়,—শিল্পেব দেশেই সে সিদ্ধ শুধু—অন্য কোথাও নয়। একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহ'লে তা' পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতবেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ তর্কাতীত। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাক্ ;—তাঁর এক একটি নাটক পড়তে পড়তে বোঝা যায় মনোবৈজ্ঞানিকের নিকট যেমন ক'রে পাই তেমন ক'রে নয়, মানবচরিত্র ও মানুষের প্রদেশ সম্বন্ধে নানারকম অর্থ ও প্রভূত সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্রবীজনের গভীরে গভীরে মুক্তার মত, কিংবা কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মত সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন। কারণ এখন আমরা

প্রতিভার সঙ্গে বিহার করছি সেই রাজ্যে যেটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রকে যদি ইংলণ্ডের কোনো জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে হত এলিজাবেথীয় সমাজ সম্বন্ধে, আমি ধারণা করতে পারি না যে অন্য কোনো অভিজ্ঞ সমাজনীতিবিদের চেয়ে তা' কোনো অংশে অসাধারণ কিছু হত (হয়তো হাসি তামাশা এবং যুক্তিহীন মুখর প্রশংসা থাকত সেই সমাজ ও সমাজপতিদের সম্বন্ধে)। কিংবা শেক্‌স্‌পীয়রকে যদি ইংলণ্ডের কোনো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের তখনকার রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হ'ত, সে অভিভাষণের ভিতর কোনো বাগ্মীতা থাকত বলে মনে হয় না—তা' নাই বা থাকল—কিন্তু তেমন কোনো সারবত্তাও থাকত না ইংলণ্ডের তখনকার রাজনীতিজ্ঞদের আলোচনায়ও যেটুকু রয়েছে; কিংবা তার ঈষৎ প্রতি-বিম্বও থাকত না শেক্‌স্‌পীয়রের নিজের কাব্যে অন্যরকম সারবত্তার যে আশ্চর্য্য ব্যাপক গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। বৈষ্ণব যুগ থেকে সুরু ক'রে আজপর্য্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শেক্‌স্‌পীয়রের সম্বন্ধে যে কথা বললাম রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা চলে—সব কবির সম্বন্ধেই। অন্য সমস্ত প্রতিভার মত কবি-প্রতিভার নিকট থেকেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হ'লে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্ম্মও নেই—কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্ম্মীদের হাতে যেন —কবির হাতে আর নয়।

কেউ যেন মনে না করেন আমি কবিকে কাব্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে নিষেধ করছি। আমি তা মোটেই করছি না। কবি তার ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্ম-ও-মননরাজ্যে যেখানে যে অসঙ্গতি বা অন্ধকার র'য়েছে ব'লে মনে করেন সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম ক'রতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমি বলেছি যে তার কাব্যেও কল্পনার-ভিতর-চিন্তা-ও-অভিজ্ঞতার সারবত্তা থাকবে। আমি তার প্রতিভার স্বধর্ম্মের কথা বলেছি; কাব্য সম্পর্কে যে জিনিসের বিশ্লেষণ ইতিপূর্ব্বে আমি করেছি; এবং ব্যবহারিক জীবনে যে স্বধর্ম্ম অসাধারণ কিছু দিতে পারে না এমন কি কাব্যজীবনকে নষ্ট ক'রেও দিতে পারে না বলে উল্লেখ ক'রেছি। সে যদি বাস্তবিক কবি হয়, তাহ'লে তার কাব্যের মত অসাধারণ কোনো দ্বিতীয় জিনিস ব্যবহারিক জীবনের পদ্ধতি ও প্রকাশের নিকট দান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

যাঁরা আমার প্রবন্ধ এই পর্য্যন্ত অনুসরণ করেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে

আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই ; সম্বন্ধ রয়েছে —কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকট ভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে. কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না ; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ক'রে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়. তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তব্‌ও কাব্যের ভিতর থাকে না : আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ ক'রেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তা হ'লে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধূলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য ,—অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ : সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর মাঝে-মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল ;—এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকদিন পর্য্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্য্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে ;—এই সবের অপরূপ উদ্গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়,—নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ;—এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ;— এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্ম লাভ করে।

কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয় ,—কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত ক'রে পরিবেষণ—না. তাও নয় ; কবির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'কিঙ লীয়ার' কিংবা 'বলাকা'র কবিতায়—এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিচ্ছুরণে, কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সেরকম কোনো লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ : যার পরিচয় দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে।

কিন্তু তবুও কবিতাব সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজেব সম্বন্ধ অন্তত দুই বকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতাব ভিতব একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষেব তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন ক'বে গড়তে চাচ্ছে, এব এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতিব জট খসিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দেব দিকে। এই ইঙ্গিত এত মেঘধবলিমা গভীব ও বিবাট, অথচ এত সূক্ষ্ম যে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতা তাকে উপেক্ষা কবলেও (সব সময উপেক্ষা কবে না যদিও) এই ইঙ্গিতেব প্রভাবে তাবা অতীতে উপকৃত হযেছে এব ভবিষ্যতে আবো ব্যাপকভাবে উদ্ধাব লাভ কবতে পাবে। এইজন্যই সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদেব নিজেব প্রণালীতে মানুষেব চিত্তকে যত বেশি অধিকাব কবতে পাববে সভ্যতাব তত বেশি উপকাব। কিন্তু খৃষ্টান পাদবিবা যেমন জনতাব হাজাব হাজাব বর্গ মাইলেব দিকে তাকিযে বাইবেল বিতবণ কবেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সেবকম ভাবে বিতবিত হবাব জিনিস নয়।

এই প্রসঙ্গেই ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতাব সঙ্গে কবিতাব দ্বিতীয় সম্বন্ধেব কথা ওঠাতে পাবি। কথাটা হযতো হৃদযহীন শোনাবে, কিন্তু আমাব মনে হয় তা' সত্য। কবিতা সকলেব জন্য নয এবং যে পর্যন্ত জনসাধাবণেব হৃদয নতুন দিগ্‌বলয় অধি- কাব না কববে সে পর্য্যন্ত কযেকটি তৃতীয় শ্রেণীব কবি ব স্থূল উদ্বোধন ছাডা বাজাবে ও বন্দবে -এব মানবসমাজ ও সভ্যতাব সমগ্রতাব ভিতব কোনো প্রথম শ্রেণীব কাব্যেব প্রবেশেব পথ থাকবে না, এমন কি তা বিলাস, কল্পনাবিলাস পর্য্যন্ত ব লে আখ্যাত হয এবং হবে এই সব স্থূল উদ্গাতাদেব কাছে,—যদিও আমবা জানি তা কল্পনাবিলাস নয কিন্তু কল্পনা-মনীষাব সাহায্যে যেন কোনো মহান—কোনো আদিম জননীব নিকট—যেন কোনো অদিতিব নিকট প্রশ্ন বাব বাব প্রশ্নেব বেদনা, প্রশ্নেব তুচ্ছতা, বাবংবাব প্রাপ্ত যুগেব স্তবে স্তবে যেন কোনো নতন সৃষ্টিব বেদনা ও আনন্দ, অবশেষে একদিন সমস্ত চবাচবেব ভিতব সকলেব জন্য কোনো সঙ্গতিব সৌন্দর্য পাওয়া যাবে ব লে।

কবিতা আমাদেব জীবনেব পক্ষে সত্যই কি প্রযোজন? কেন প্রযোজন? কবিতা যে এত অল্প লোকে ভালোবাসে সেটা কি প্রকৃতিবই নিযম, না কি অধিকাংশেব বিকৃত কি দূষিত শিক্ষাব ফল? যদি আবো বেশি লোকে কবিতা ভালোবাসতে ও বুঝতে শেখে তাহ'লে সেই অনুপাতে তাবা ভালো ক'বে বাঁচতে শিখবে কিনা - অর্থাৎ সেই অনুপাতে সমাজেব মঙ্গল হবে কিনা? মানুষেব সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুখেব ক'বে গড়বাব সংগ্রামে ও সাধনায় কবিতাব স্থান

কোথায় ?—এ প্রশ্নগুলি কোনো হিতসাধনমণ্ডলীর কর্ম্মসচিবদের প্রশ্ন বলে মনে হয় কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসাগুলো নিটোল ও আন্তরিক, এবং বিশদভাবে নয়, সংক্ষেপে, হয়তো ইসারায় এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আমার উপরের কয়েকটি লাইনের ভিতর নিহিত রয়েছে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার; কিন্তু সেই পরিবর্তন আনবে কে ? সেই পরিবর্ত্তন হবে কি কোনোদিন ?—যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মত জনসাধারণ থাকবে না আর ? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডে কিংবা ধরা যাক উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণ-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে ? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাসার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণী সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্ব্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন ? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তীজননীর মত যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলছে তখন মনে হয় যে কোনো সূক্ষ্মতা, পুরোনো মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তর বিরুদ্ধে যা, পুরোনো প্রদীপকে যে-অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্ত্তন করে ফেলে; তার এই সাময়িকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্য শুধু—সকলের জন্য নয়—অনেকের জন্য নয়।

কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হবে কি ? কবে ? কে আনবে ? কবিকে কি শিক্ষার অধিনায়ক সাজতে হবে ? সৌন্দর্য্যপ্রবাদে স্পন্দিত করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে ? প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করতে হবে ? ডিক্টেটর সাজ্‌তে হবে জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহ'লে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর; তার নিজের প্রতিভার নিকট তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে; যে কতিপয় হয়তো ক্রমে ক্রমে বেড়েও যেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আপোষ-অবলেপের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে। আর যদি সভ্যতার মোড় ঘুরে না যায় তাহ'লে কমরেডের দল এবং সাহিত্যের হব্‌গব্লিনেরা কাব্যের জন্য একটা কিছু করবেনই নিশ্চয়। সাহিত্য-জগতে গ্যয়টে বা ল্যাম, কিংবা তাঁর নিজের ভাবে পেটার, অথবা রবীন্দ্রনাথ অথবা

ইয়েটস্, কিংবা স্বসৃষ্ট পরিধিবিশেষের ভিতর এলিয়ট ইত্যাদির মত প্রকৃষ্ট রস-বোদ্ধাদের কথা ছেড়ে দিলেও বিদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভিতরেও এমন অজস্র খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই ; এদেশে রসবোধ যে হৃদয়হীনভাবে বিরল কবির কোনো কোনো শিথিল মুহূর্ত্তের নিকট এর তিক্ততাও কম নয়।

কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাতসলিলে খাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্ম্মীদের সহানুভূতি যার জন্য একটুও নেই তিনি কি করবেন ? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন—সহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য সেই চেষ্টা করবেন ;—আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর ;—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকটে যেন, নির্জ্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির নিকট।

তার প্রতিভার নিকট কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে ;—হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের, সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে বুননের জন্য।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য

হেগেল্কে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দিলে কোথাও কোনো গলদ আর থাকবে না, নীহারিকার সৃষ্টি থেকে আরম্ভ ক'রে ধনিক সভ্যতার বিনাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মূলতত্ত্বটি জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে—এমনতর ভোজবাজিতে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি যাঁদের নেই তাঁরাও অস্বীকার করবেন না যে মানবজীবনের বিবিধ ধারা, আর্থিক এবং পারমার্থিক, পরস্পরকে অনেকখানি নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করে। তাই এ-কথা বিচিত্র নয় যে আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অসমগতি এবং ধন-উৎপাদন ও বণ্টনের অব্যবস্থা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে-ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে তার অনুকম্পন কবিতার মতো অন্তঃপুরবাসিনীর দেহেও এসে লাগল। নানা

প্রশ্ন ও সমস্যার মধ্যে আধুনিক কবিরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন, এবং যেটা সবচেয়ে দুর্ভাবনার কথা, জনসাধারণের সঙ্গে, এমন কি শিক্ষিতসাধারণের সঙ্গেও, তাদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।

নালিশ উঠেছে প্রধানত দুটি কথা নিয়ে। অধিকাংশ পাঠকের মুখে শোনা যায় যে কবিরা দিনকের দিন এমনই অভিনব ভাষা আর উদ্‌ভট ভঙ্গির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন যে সমসাময়িক কোনো কবিতা বুঝবার দুঃসাধনায় সপ্তাহখানেক মগজ খাটিয়ে দুটো চারটে শব্দকোষ মহাকোষ ঘেঁটে বুদ্ধি যদি বা বাড়ে, বিদ্যা যদি বা প্রশস্ত হয়, রসের আস্বাদটুকু কিন্তু মেলে না। দ্বিতীয় অনুযোগের বিষয় হচ্ছে এস্কেপিজ্‌ম্। ঐ বস্তুটা অবশ্য এ-যুগের কবিদের উদ্‌ভাবন নয়। ব্যাধি বেদনা আর ব্যর্থতায় ভরা এই পৃথিবী থেকে পলাতক 'অদৃশ্যপক্ষ'-সঞ্চরণশীল কীট্‌স্-এর কবিতাও এস্কেপিষ্ট্! জিনিসটা পুরাতন হলেও তার সম্বন্ধে নালিশটা সদ্য নূতন, মার্ক্সীয় সাহিত্যবিশারদদের অবদান। মোটের উপর অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে একদিকে কবিতার পাঠকসংখ্যা (নিতান্ত বাজারী ঠুন্‌কো প্রেমের কবিতা বাদ দিয়ে) দ্রুত গতিতে শূন্যের দিকে এগুচ্ছে, এবং অন্য দিকে আমাদের কবিরা বর্ত্তমান সমাজ ত্যাগ ক'রে কেউ বা এ্যাংলোক্যাথলিসিজ্‌ম-এর মধ্যযুগে অন্তর্দ্ধান করেছেন, কেউ বা পৌরাণিক যুগের ভাঙা দেউলে ব'সে নিজের হাতে গড়া প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদন করেছেন।

কবি ও কবিতার নেপথ্য-বিলাস কিন্তু বেশি দিনের নয়। হোমরের যুগে শেক্স্‌-পীয়রের যুগে এদের বানপ্রস্থ ধারণ করতে হয় নি, এবং প্রাগৈতিহাসিক কালে তো কাব্য নৃত্য প্রভৃতি ললিত কলাই ছিল জাতীয় (tribal) সংযোগের প্রধান উপকরণ। বহু লোকের সম্মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি বা গীতি (তখন কবিতা আর গানের অঙ্গ-বিচ্ছেদ ঘটে নি) প্রাক্‌সভ্য মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ছিল। কড্‌ওয়েলের বিশ্বাস যে ছন্দোবদ্ধ ভাষার তখন বিশেষ function ছিল এমন সব ক্ষেত্রে উপজ্ঞাগত উদ্যম জাগিয়ে তোলা যেখানে কোনো প্রত্যক্ষ উদ্দীপক চোখের সামনে উপস্থিত নেই। বাঘ দেখলে এ্যাড্রিনলীন্-নিঃসরণের দ্বারা ছুটে পালাবার অনুকূল বেগ ও বলসঞ্চয়ের বিধান শরীরের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু ছ'মাস পরে যে-ফসল ফলবে তার আয়োজনের উপযুক্ত সঙ্কল্প ও উত্তেজনা সরবরাহের দায়িত্ব ছিল কাব্যের। সমষ্টির সান্নিধ্যজনিত এই আবেগ কবিতা বা গানের সঙ্গে ক্রমশ এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ল যে নির্জ্জনেও যদি কেউ তার পুনরাবৃত্তি করত তা হলে সে বুলবুলের কূজন-মুখরিত কোনো পত্র-নিবিড় নিকুঞ্জে গিয়ে পৌঁছোত না,

সে পেত নিজেকে তার সমগ্র জাতির মর্ম্মস্থলে। আর্টের নিভৃত চর্চ্চার মধ্যেও অটুট রইল জনগণের সঙ্গে সমবেদনাবোধ।

তারপরে প্রাথমিক সাম্যতন্ত্রী সমাজকে সরিয়ে দিয়ে এল শ্রেণী-বিভক্ত ধনতন্ত্রী সমাজ, আর্টের জাতীয় রূপ ঘুচল, দেখা দিল তার শ্রেণীরূপ। সেই রূপ ছিল এলিজবিথীয় যুগের। কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে কাব্যের যোগ অবশ্য রইল না, কিন্তু শিক্ষিত বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ে তার গতি ছিল অবাধ। শেক্স্‌পীয়রের নাটকে রস পেত না এমন ভদ্রব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কবির সে-প্রতিপত্তিও আজ আর নেই। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির ফলে বইয়ের প্রচার হাজার গুণে বেড়েছে, অথচ কবিতার পাঠক খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজ ছেড়ে, শ্রেণী ছেড়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারে আধুনিক কবিতার আত্মহত্যা আজ আসন্ন। এর দুটি প্রধান কারণ :

১. ফলিত বিজ্ঞানের কল্যাণে সাধারণের চিত্তাধিকার-ক্ষেত্রে কবিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দাঁড়িয়েছে সিনেমা, রেডিয়ো, খবরের কাগজ আর ছ'পেনি উপন্যাস। এদের স্থূল উত্তেজনা আর লঘু চিত্তবিনোদনের সঙ্গে কাব্যের সূক্ষ্ম রসপরিবেশন পেরে উঠবে কেন। এ প্রতিযোগিতাটি তেমনি অসম এবং অসঙ্গত যেমন কারখানার সঙ্গে কারিগরের প্রতিযোগিতা। কবিকেও হঠতে হল, কারিগরকেও হার মানতে হল, এবং উভয় ক্ষেত্রে পরাভবের অভিমান একই প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে—কড্‌-ওয়েল যার নাম দিয়েছেন skill-fetishism। তারা আপন আপন কৌশল ও দক্ষতা নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তার অসঙ্গত মূল্য দাবী করলেন, এবং সকলের কাছে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন যে অন্তত এক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দিগ্ধ। ইংরেজী সাহিত্যে এর ফল ততটা পরিস্ফুট হয় নি যদিও ইডিথ্‌ সিট্‌-ওয়েল্‌, কমিংস্‌ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে, কিন্তু ফ্রান্স্‌-এ সিম্বলিষ্ট্‌ প্রচেষ্টার উৎস এইখানে। তাঁরা শব্দার্থকে অগ্রাহ্য ক'রে শব্দের ধ্বনি ও রূপের অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পদ্য রচনা করলেন, মালার্মে উপদেশ দিলেন "Poetry is written with words, not ideas", কবিতা হল শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য, বোধ্য আর রইল না।

২. দুর্বোধ্যতার দ্বিতীয় কারণের সঙ্গেও বর্তমান সমাজবিপ্লবের সম্বন্ধ রয়েছে কিন্তু তা অংশত, আসলে সেটা কাব্যধর্ম্মপ্রসূত। পণ্ডিতেরা শব্দের দুই প্রকার অর্থ নির্ণয় ক'রে থাকেন, প্রথমটাকে অভিধা এবং দ্বিতীয়টাকে অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। অভিধা সম্পূর্ণ বিষয়গত, শব্দ সেখানে সঙ্কেত মাত্র, শ্রোতার মনকে কোনো বাহ্যবস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে নেওয়াই তার একমাত্র কাজ। বৈজ্ঞানিক

ভাষার এই আদর্শ, এবং এর পরিপূর্ণ সিদ্ধি বোধ হয় শুধু গণিতেই সম্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তি একান্ত বিষয়ীগত, শব্দের বাহ্যসঙ্কেত সেখানে লুপ্ত না হলেও গৌণ, তার ব্যবহার বাহন রূপে, বক্তার মনোভাব বা হৃদয়াবেগকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে। কবিতায় নিত্যব্যবহার্য্য কোনো একটি শব্দ নিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে তার বিষয়-নির্দ্দেশক আভিধানিক অর্থ ব্যতীত তার সঙ্গে বহুতর চিত্রকল্পের ও তৎসংশ্লিষ্ট আবেগের আনুষঙ্গিক যোগ বিদ্যমান। কবির শব্দচয়ন ও বিন্যাসের অভিপ্রায় এই আনুষঙ্গিক চিত্রকল্পসমাবেশে উদ্দিষ্ট ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা। ধ্বনির তারতম্য এবং ছন্দের বন্ধন পাঠকের মনকে তন্দ্রাবিষ্ট ক'রে তার স্বাভাবিক বিষয়ানুগত্যকে প্রতিরোধ ক'রে আবেগসঞ্চারের সহায়তা করে। অবশ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন কবির সাধ্যও নয়, কাম্যও নয়। কারণ ভাবানুষঙ্গ নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। পর্ব্বত শব্দটা আমার কাছে ব.হু ও ধূম্রের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রতীক, আপনার চোখের সামনে হয়তো পুরীর সমুদ্রতীরের ছবি নিয়ে আসে, এবং আরেক জনকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান-পদ্ধতির নিয়মাবলী। অবশ্য কল্পনার এই যদৃচ্ছগতি খানিকটা অবদমিত হয় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শব্দের চাপে, তবু কবিতা যদি উৎকেন্দ্রিক হয়ে বিভিন্ন পাঠকের খাম-খেয়ালী মর্জ্জীর স্পর্শরেখা ধ'রে বিবিধ দিকে ছুটতে না চায়, যদি সকল পাঠকের মনে মোটের উপর একই রকম ভাবাবেগের উদ্বোধন তার লক্ষ্য থাকে, তা হলে তাকে আশ্রয় নিতে হবে একটি বাহ্য ও সার্ব্বজনীন বিষয় বা বৈষয়িক পরিস্থিতির। বিষয় যেন বিষয়ীকে ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা দরকার। কবিতার চরম সিদ্ধি নির্ভর করে তার অভিধাগত ও অভিব্যক্তিগত অর্থের নিখুঁৎ ভারসাম্যের উপর। আগেকার দিনে সে-ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটত অভিধার চাপে অভিব্যক্তির লোপ পাওয়াতে। আজকাল কিন্তু রুচির বদল হয়েছে, ঝোঁক পড়েছে অভিব্যক্তির উপর। বাঙলা সাহিত্যে এর উদাহরণ বিষ্ণু দে। যেখানে তাঁর অবহিত কলাকৌশল ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে, সেখানে তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করেছেন, যথা ওফেলিয়া বা ক্রেসিডায়। (এগুলির পরিস্থিতি জীবন থেকে নেওয়া হয় নি, পরিচিত নাটক থেকে আহরণ করা হয়েছে, তবু সেটা বিষয়গতঃ কারণ তা সাধারণের অধিগম্য, বহুলোকের পূর্ব্ব কাব্যপাঠের দ্বারা তার বিষয়ীত্ব ঘুচে গেছে।) আর যেখানে তিনি সে-ভারসাম্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে একান্ত নিজস্ব সাধারণের অনধিগম্য অনুষঙ্গ ও স্মৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়েছেন (অগ্নিস্মার, এবং সম্ভবত ঘোড়সওয়ার কবিতায়) সেখানে পাঠকের মন, অন্তত আমার মন, সম্পূর্ণ-

রূপে সাড়া দিতে অক্ষম। কাব্যের এই নবরীতির সমর্থনে এলিয়ট্‌ লিখছেন :

"The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him : much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way ; some of them, assuming that there are other minds like their own, became impatient of this 'meaning', and perceive possibilities of intensity through its elimination."

মুস্কিল এই যে কবির মনের অনুরূপ কোনো পাঠকেরই মন হয় না, এবং হয় না বলেই কবিতার একটি 'meaning' অর্থাৎ বহিঃপরিস্থিতিব আশ্রয় দরকার। তবে সমসাময়িক কবিদের পক্ষে এমন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় তো সম্ভব যে আজকের দিনে সমাজের স্তবে স্তবে ভাঙন ধবেছে, তাব দিগন্তব্যাপী বিকৃতি ও বিনাশের মধ্যে তাঁদেব রূপায়নিক কল্পনা কোনো আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, ফিরে আসছে ব্যাহত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে। তাঁদের আত্মপরিক্রমা মানুষেব প্রতি ঔদাসীন্যের ফল নয়, নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া। আমাদেব দেশেব কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই মনোভাবের প্রতিভূ। তিনি যে-"অবিকল সিদ্ধ স্বয়ম্বশ চিরসত্তা"কে আপন অন্তর্নিবিড চৈতন্যে সন্ধান করেছেন, তাব পটভূমিকায় রয়েছে তাঁর বিশ্বাস যে

"মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট,
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।"

একে defeatist ভাববিলাসিতা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া বৃথা, কারণ এখানে জয় পরাজয়ের আদর্শ নিয়ে মতভেদ।

সাম্যবাদী বলতে চান যে, আমাদেব শিল্পীরা যে শ্রোতা বা পাঠকের দিকে পিঠ ফিবিয়ে তাঁদেব শিল্পরচনাকে স্বগতোক্তিতে পবিণত করেছেন, এটা বণিক সভ্যতার নিদেন কালেব লক্ষণ। এই সভ্যতার দেহে যতদিন প্রাণ ছিল ততদিন তার সঙ্গে কাল্‌চারের সম্বন্ধ ছিল নিবিড, তার আর্ট্‌ ছিল সামাজিক ও প্রগতিশীল। আজ ইতিহাসের রথচক্র তার উপর দিয়ে চলছে, তার বৈদগ্ধ্যের বহুমূল্য উপকরণ-গুলি ভেঙে চুরে মিস্‌মার হয়ে গেল ব'লে। আজ আমাদের চোখের সামনে দুলছে

এক নবীন নিঃশ্রেণীক সমাজের দৃশ্যপট, আমাদের মনন ও মনীষার কেন্দ্র সেইখানে, আমাদের ভাব ও আবেগের উৎস তারই তলে। কাজেই শুনতে পাই, "No book written at the present time can be 'good', unless it is written from a Marxist or near-Marxist point of view' (Upward —The Mind in Chains)। আর্টের উপর দলপতিদের দণ্ডচালনা এইখানে থেমে যায় নি, হুকুম হল যে তাকে আপন সাবেকী নির্লিপ্ততা আর আত্মম্ভরিতা ভুলে গিয়ে সোজাসুজি লাগতে হবে দলের কাজে : "Art, an instrument in the class struggle, must be developed by the proletariat as one of its weapons." (Freeman, Proletarian Literature in U. S. A.)। কিন্তু আর্টকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করব কিসের জন্যে ? কোনো সমাজ-ব্যবস্থা, তা সে শ্রেণী-বিভক্তই হোক আর শ্রেণী-বিবর্জ্জিতই হোক, চরম মূল্যের দাবী করতে পারে না। যে-অনাগত সমাজের উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজনে শিল্পীদের আহ্বান করা হচ্ছে তার মূল্য কিসে, তার সার্থকতা কোথায় ? নিশ্চয়ই সেটা কেবল এই নয় যে তাতে সক্ষমেরা নির্ব্যতিরেকে খাটবে আর খাবে আর ঘুমুবে, বৃদ্ধেরা বিশ্রামাগারে ব'সে ঢুলবে, আর শিশুরা ঘর বা হাসপাতাল ভরবে। যদি তার কোনো সার্থকতা থাকে তবে তা এই যে আজ যে-চরম মূল্যের সন্ধান আমাদের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠীরা পেয়েছেন, তার যোগ্যতা এবং সুযোগের ক্ষেত্র সেখানে সকলের জন্য অবারিত হবে। চিৎপ্রকর্ষ আর চারুশিল্পের সম্প্রসারণই যদি সমাজবিপ্লবের লক্ষ্য হয়, তা হলে আর্টকে সে-বিপ্লবী কার্যক্রমের অন্যতম অস্ত্র বলতে গেলে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে একটি মারাত্মক গরমিল থেকে যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে, যার দু'বেলা অন্নের সংস্থান নেই, পরমার্থলাভের চেয়ে পরমান্নলাভের প্রয়োজন তার অধিক। আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা যদি পরমার্থের কথা না ভাবি, তা হলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'জনের হল আর ক'জনের হল না, কোনো সভ্যতার মূল্য-বিচার সে-তালিকার উপর নির্ভর করতে পারে না। অবশ্য যুগসন্ধিকালে এমন অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটতে পারে যাতে বেঁচে থাকবার তাগিদই সকলের পক্ষে সর্ব্বগ্রাসী হয়ে উঠবে। যেমন যুদ্ধের সময়ে শিল্পী তার তুলি রেখে, বৈজ্ঞানিক তার গবেষণা ছেড়ে, হাতে বন্দুক ধরতে বাধ্য হয়। আজকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সে-দুর্দ্দিন এসেছে এটা সম্ভব, হয়তো সত্য। আর্টিস্টরা তাঁদের সমস্ত শক্তি সমস্ত সাহস নিয়ে ফাশিষ্ট-বর্ব্বরতা-বাহিনীর সম্মুখীন হবেন, এটা তাঁদের পক্ষে অগৌরবের কথা নয়। কিন্তু রণপ্রাঙ্গণে সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের হাতে যে-কাজ দেবেন তাকে আর্ট বলবার নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি

যেন আমাদের না হয়। সাম্যবাদের উর্বর ভূমিতে হয়তো সোনার ফসল ফলবে, কিন্তু শ্রেণী-সংঘর্ষের যন্ত্রস্বরূপ সাম্যবাদী শিল্প হচ্ছে আমাদের দার্শনিকদের পরিভাষায় 'বন্ধ্যাপ্রসূতি।"

এস্কেপিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে মার্ক্স-পন্থীরা যে-বিসংবাদের অবতারণা করেছেন সেখানেও তাঁদের সাহিত্য-বিচার অনুজ্ঞাবাহক। সাহিত্যকে বস্তুতান্ত্রিক হতে হবে, বাস্তব-মুখীন হতে হবে—এই কথাগুলি মেনে নেবার আগে জানতে চাই কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অবাস্তব। চোখ খুলে সামনে যা দেখতে পাই, যাকে আমরা চলতি বাঙলায় বলি "ফ্যাক্ট্‌", তাই কি বাস্তব? তা হলে তো সাম্যবাদীদের প্রসাদ-লালিত পদার্থবিদেরাই এস্কেপিষ্টের চূড়ান্ত। আইন্‌স্টাইনের চতুরায়তনিক বঙ্কিমতা কিম্বা শ্রোয়ডিঙরের সম্ভাবনা-তরঙ্গের সঙ্গে টেবিল চেয়ার ঘর-বাড়ীর সম্বন্ধ কতটুকু? অবশ্য প্রতীয়মান বস্তুমাত্রের জন্য সাম্যবাদীদেরও বড় একটা মাথাব্যথা নেই, তাঁদের "বাস্তব' হচ্ছে ডায়লেক্‌টিক্‌-গতি-ধর্ম্মী জড় প্রকৃতি। এটা যে প্রত্যক্ষ নয়, আনুমানিক, বহু মতবাদের মধ্যে একটি মতবাদমাত্র, তা বোঝাবার জন্য পরিভাষা-কণ্টকিত কোনো প্রমাণের আবশ্যক নেই। এবং এই মতবাদটিকে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় স্থাপিত করবার জন্য এঙ্গেল্‌স প্রমুখ যে-সব দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা ভগবানের অস্তিত্বের বাজারে-চল্‌তি "প্রমাণে"র চেয়েও হাস্যকর। তবু এই ধ্রুব সত্যটিকে আর্টের মধ্যে রূপ দিতেই হবে। যদি আপনার শিল্পী মন তথ্যের অন্তরালে অন্য কিছুর সন্ধান পেয়ে থাকে, তা সে গ্রীক নাট্যকারদের অন্ধ নিয়তিই হোক 'কম্বা 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন'ই হোক, তা হলে আপনাকে শিষ্ট ভাষায় এস্কেপিষ্ট্‌ বলা যায়, কিন্তু আসলে আপনি ফাশিষ্ট্‌, স্বার্থান্ধ, সভ্যতার শত্রু।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একাধারে সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য রক্ষা ক'রে টি, ই, হিউম্‌ লিখিয়েছেন যে, প্রত্যেক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ ধারার মূল-উৎস হচ্ছে কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসগুলি যুগ-চৈতন্যের যে-অসংজ্ঞাত স্তরে সক্রিয় সেখানে যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই, প্রমাণ অপ্রমাণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উত্তর-রেনেসাঁস চিৎপ্রকর্ষের মূলে রয়েছে হিউম্যানিজ্‌ম অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজ শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস, এবং তার প্রগতির অনন্ত সম্ভাবনার স্বীকৃতি। হিউম্যানিজ্‌ম্‌কে হিউম্‌ ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁর বিবেচনায় মধ্যযুগের মূল্যবোধই সত্য, অন্তত অধিকতর সত্য। সে-মূল্যবোধে মানুষ অকিঞ্চন, প্রগতি কবি-কল্পনা, জীবনের শেষ পরিণতি অনিবার্য্যরূপে ট্র্যাজিক্‌। চরম মূল্যের আধার মানুষ নয় ভগবান, অনাত্মীয়, সুদূর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভগবান।—এমন প্রাথমিক প্রাগানুবীক্ষিকী

(prelogical) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যার বিচার সম্ভব নয়, তার কোনো অর্থই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিউম্ নিজেই প্রচার করেছেন যে আমাদের সংস্কৃতির সমগ্র রূপকল্প এই বিশ্বাসের দ্বারা নির্দ্ধারিত। সুতরাং আমাদের বিচারের পদ্ধতি ও প্রতিমাণও সে-বিশ্বাসের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। সে-বিশ্বাসকে বিচার করতে চাইলে যুগধর্ম্ম নিরপেক্ষ প্রতিমাণ আবশ্যক। তেমন কোনো প্রতিমাণের সম্ভাবনা হিউমের দর্শনে নেই। তবে তর্কের পথ ছেড়ে দিয়ে কবি হিউম্ বলতে পারেন যে হিউম্যানিজ্‌ম্-এর রূপায়নিক প্রাণপ্রবাহ আজ নিস্তেজ হয়ে এসেছে। মানুষের মতন মানুষের বিশ্বাসেরও জন্ম জরা ও মৃত্যু ঘ'টে থাকে। যদিচ তার পরমায়ু "তিন কুড়ি দশ"-এর অধিক, তবু এমন দিন আসে যখন তার প্রাণের দৈন্ত আর ঢেকে রাখা যায় না। সে-দৈন্তের চেহারা আজ শিল্পীদের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, তাই তাঁদের সৃজনীশক্তি ব্যাহত, আত্মসম্বোধনরত। এর হয়তো কোনো উপায় নেই, ইতিহাসের অনাদ্যন্ত প্রবাহ এমনি ক'রে ভাঙে আর গড়ে। চিরাগত বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ভিৎ গেছে ভেঙে, তার ভগ্নস্তূপের উপর নতুন যুগের ইমারত যতদিন না মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন আমাদের কবিদের গলা শোনাবে "শান্ত অর্থহীন, যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।" ততদিন আমরা কেবল চেয়ে দেখব চারিদিককার প্রাণস্পন্দিত শ্যামলিমা যাচ্ছে বিবর্ণ হয়ে, যেখানে বনস্পতি ছায়া বিস্তার ক'রে ছিল সেখানে রইল শুধু রিক্ত বিস্তৃত মরুভূমি। আর সে-মরুভূমির তৃষ্ণার্ত্ত হাহাকারে রইল এ-যুগের ছন্দহীন প্রার্থনা :

> "অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
> সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
> দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
> আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
> রাত্রের নির্জ্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
> আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়াফুল,
> নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

লীলাময় রায়

আধুনিক বাংলা কবিতা

আধুনিক বাংলা কবিতার কথা উঠলে সসঙ্কোচে বলতে ইচ্ছা করে, এমন করে আর ক'দিন চলবে।

গল্প বেশ চলছে, প্রবন্ধ মন্দ চলছে না। অথচ কেবল কবিতা এবং কবিতার চেয়েও পশ্চাদ্‌পদ নাটক। কিন্তু নাটকের কথা থাক্‌।

আমার বিশ্বাস কবিতা যে ভাষায় লেখা হয় সে ভাষা আধুনিক বাঙালীর ভাষা নয়। কাব্যে অরুচির এ হলো প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ আমার মতে অব্‌-জেক্‌টিভিটির অভাব। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—এই হচ্ছে দেশের স্বরূপ, তথা কবিতার স্বরূপ।

পদ্যের ভাষার দশা দেখে অনেকে পদ্যই ছেড়েছেন, পরিবর্তে লিখছেন গদ্য এবং নাম দিচ্ছেন গদ্যকবিতা। আমাদের গদ্যের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, যথেষ্ট লঘুভার না হলেও যথেষ্ট সাবলীল, লক্ষ্য ভেদ না করলেও শরের মতো তীক্ষ্ণ। এমন গদ্য থাকতে পদ্য লিখতে চাওয়া নেহাৎ জোর করে চাওয়া কিম্বা অভ্যাসবশে চাওয়া। অনেকে পদ্যের সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে গদ্যের ভাগ্যেব সঙ্গে কবিতার গাঁটছড়া বাঁধছেন! এ একবকম ম্যারেজ অফ কন্‌ভিনিয়েন্‌স্‌। এব পক্ষে বহুৎ যুক্তি আছে। আর এই তো সংসারেব নিয়ম। তা হোক, আমার স্থির ধাবণা গদ্যে কবিতা হতে পারে না। যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব। যাঁবা গদ্যকবিতা সুরু করেছেন তাঁদের পদ্য কবিতায় ফিবে আসতেই হবে, কেননা পদ্যকবিতাই কবিতা। কবিত্বের স্বাদ লোভনীয়, কিন্তু কবিতার স্বাদ মোহনীয়। আসতেই হবে ফিরে, তবে তার আগে পদ্যের ভাষা গদ্যের মতো আধুনিক হওয়া চাই। প্রায় অসাধ্য সাধন, তবু আশা আছে। বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো পদ্যকবিতায় আধুনিক ভাষার আভাস পেয়েছি। তাঁর উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। বিষ্ণু দের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা চলে।

গদ্য পদ্যের স্থান পূরণ করতে পারে না, পদ্য থাকবেই, হয়তো তার পরিণতির এই শেষ, তবু তার শেষ নেই। কবিতাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বিয়ের উপহার ও শিশুর পারিতোষিক বাবদ তার চাহিদা থাকবে। শিশুপাঠ্য মাসিকে যেসব পদ্য ছাপা হয় সেইসব ছড়া কবিতার জন্য রাস্তা বাঁধছে, একদিন ঐ সড়কে

কাব্যের মোটর শিঙা ফুঁকবে। বিশ্বের পদ্যের কাছে তেমন কোনো দুরাশা নেই, একদা সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা যে কাজ হতো এখন কৃত্রিম পদ্যের দ্বারা তাই নয়, কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান।

তারপর অবজেক্টিভিটির প্রসঙ্গ। এর পারিভাষিক হাতের কাছে যা পেলুম তা গ্রহণের অযোগ্য। আমার বক্তব্য এই যে বাংলা কবিতা যা বলতে চায় তা ছাড়া আর সবই বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলে, কিন্তু সেই জিনিসটি বলে না। কী করে বলবে, স্বয়ং বক্তার কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার নয়, তিনি বকবক করতেই—বকম বকম করতেই—ব্যস্ত। নিজের বানানো গোটাকতক বাক্য আর বাক্যাংশ তাঁকে মশগুল করে রাখে, কী বলতে চেষ্টা করে কী বলে চল্লেন তার হিসাব নেই। হয়তো তিনি চেষ্টাও করেন না, কলম আপনি দৌড়ায়, কাগজ আপনি কালো হয়, কালি আপনি ফুরোয়। আমাদের কবিদের ভাব আসে, তাঁরা ভাবাবেশে ইম্‌প্রোভাইজ করেন, আমাদের গায়কদের মতো ইম্‌প্রোভাইজেশনের উপর তাঁদের প্রচণ্ড ঝোঁক। সঙ্গীতকারদের রাগালাপ আর কাব্যকারদের বাক্যালাপ উভয়ের সাদৃশ্য সাতিশয় তাজ্জবকর।

আধুনিক বাঙালীও আধুনিক মানুষ। তার সময় কম, তার কাজ আছে। সে ঘড়ি ধরে গান শোনে, ছবি দেখে, কাব্য পড়ে। লোকটা আর যাই হোক বেহিসাবী নয়। বেহিসাবী বাগ্‌বহুল তরল কবিতা—তরল অথচ গন্তব্যহীন—তার কাছে উপদ্রববিশেষ। আধুনিক জীবনের সঙ্গে আধুনিক কবিতার বনিবনা ঘটছে না। জীবনের ক্রমেই প্রত্যয় হচ্ছে যে কবিতার কিছুই বলবার নেই, শুধুমাত্র বলাটাই তার বলবার। এত বড় জলজ্যান্ত জীবনটা সামনে পড়ে রয়েছে, তবু তার বিষয়ের অভাব! আমার মনে হয় বাণীকে বাহন না করে উপাস্য করাতেই এই দুর্গতি। এর প্রতিকার, বাক্যের সন্ধান ছেড়ে বস্তুর উপর মন দেওয়া। প্রয়োজন হলে বস্তু আপনি আপনার বাক্য গড়ে নেয়।

বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ নিরর্থক হবে না, যদি সে কানের ভিতর না দিয়ে সরাসরি মর্মে প্রবেশ করে।

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রার্থনা

বাল্‌বে নাম্‌লো ঠাণ্ডা ঘুম
এখন সকাল হ'লো।
রাত্রির সমান সমতল পার হ'য়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি
বন্ধুর সকালে।
দাঁড়কাকের কর্কশ চীৎকার ট্রাম-লাইনে,
খণ্ডিত আকাশে ম্লান রক্ত।

তারপর দু'পয়সার দেশি কাগজে
এক কাপ চায়ের আয়ুপান চলে,
চোখে ভাসে বিক্ষত চীন আর স্পেনের মূর্তি,
আর স্বস্তিকার স্বস্তিহীন অরণ্যে
নাৎসিরা হাঁটে।
ভাঙা-জান্‌লার ওপারে ডাস্টবিন—
ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক আর কুকুরের ভিড়ে
এখন সকাল হ'লো।
পাশের বস্তি থেকে কদর্য কলহ কানে আসে,
গত রাতের ভালো-লাগা 'শেষের কবিতা' জোলো লাগে।

নান্দীমুখ

তোমার যোগ্য গান বিরচিবো ব'লে,
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে,
পুষ্পিত তৃণদলে।
শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে,
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে,
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান,
গান বিরচিবো ব'লে ॥

তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা।
আর্দ্র, ধূসর, অতনু নগর,
মৎসর প্রেতপারা,
প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে।
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তার হানাতে।
ছায়াপ্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা?
কী নাম শুধাই—উত্তর নাই;
ঝরে শুধু বারিধারা ॥

মুখে একবার তাকায়ে নির্নিমেষে
শূন্যপ্রভব দেব না দানব
আবার শূন্যে মেশে।
বুঝি তারা শুধু কুজ্ঝটিকার চাতুরী;
তবু তুলনায় ধন্ধ জাগায় মাথুরই।

প্রতীকপ্রতিম তাদের কাস্তে, হাতুড়ি
ফসল মুড়ায়, মানমন্দির পেষে।
মূর্ত্ত নিষেধ, মূক নির্ব্বেদ
তাকায় নির্নিমেষে॥

কখনো কখনো মনে হয় যেন চিনি—
বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা
চীনে পটে বন্দিনী।
স্পেনেও হয়তো অমনি অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী ;
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি
পশে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন ;
অথচ তাদের চিনি॥

ভালোবেসেছিলো তারাও, আমার মতো,
সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট,
তারারাশি বাতাহত।
গড্ডলিকার সহবাসে উত্ত্যক্ত,
তারা খুঁজেছিলো সাযুজ্য সংরক্ত ;
কল্পতরুর নত শাখে সংসক্ত
শুক্ল শশীরে ভেবেছিলো করগত।
নগরে কেবল সেবিলো গরল
তারাও, আমার মতো॥

কিন্তু শূন্যে ছড়ায়ে ঊর্ণাজাল
মধুমক্ষীরে উপহাসে ঘিরে
জাগ্রত মহাকাল।
জলপ্রাণীও পারে না তা থেকে পলাতে
পোড়ে মৌচাক আধিদৈবিক অলাতে ;

নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে
অপসৃত হয় গুপ্তির জঞ্জাল।
কানা মাছি উড়ে ; ত্রিভুবন জুড়ে
কালের ঊর্ণাজাল॥

তাই আমাদের সমাহিত অভিসাবে
ঘটে দুর্গতি ; মৌন অবতি
সঙ্কেত প্রতিহাবে।
বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে
অঙ্গুলি তুলি দেখায় অলখ নিষাদে।
বুঝেও বুঝি না নিবাকাব আঁখি কী সাধে.
প্ররোচিত কবে ত্যাগে না অঙ্গীকাবে।
মাগে প্রতিশোধ, মানায প্রবোধ,
অনিকেত অভিসাবে॥

তাব স্বাধিকাব আগে ফিবে দিতে হবে ,
নতুবা নগব তথা প্রান্তব
ভ'বে ববে বাসী শবে।
অশক্য পিতা , বলীব কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যাভিচাবে আজ মগ্ন ,
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গবাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধিব তাণ্ডবে॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক্ লোক-পরিবাদ।

জীবনের নাট্য-যবনিকা
পড়ে' যাবে মনে রাখো নাকি?
মুছে গেলে জীয়ন্ত জীবিকা
কী করিবে তখন একাকী?
শুধু চোখে ক্লান্ত গতভাষ!

হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার,
কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে
পক্ষধ্বনি শত বলাকার।
ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে।

উতরোল নিবিড় রজনী।
খোলো রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান-শঙ্কা ছাড়ো!
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাখো মানুষের মন!

উপরেতে আকাশ ছড়ানো,
নীচে কাঁপে মদালসা বায়ু,
হে ললিতা, কাছে এসো শোনো—

হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু !

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ !

তাণ্ডবের দীর্ঘশ্বাস শুনে
আছিলাম ঘোর অচেতন,
আকাঙ্ক্ষার জাল বুনে-বুনে
এইবার হয়েছে উধাও
বক্ষোমাঝে উদ্ধত নয়ন !

এই লহো মোর দুই হাত ।
অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি !
ক্লান্ত তনু সুন্দর অক্ষয় ।

অরুণকুমার মিত্র

যুদ্ধ-বিরতি

ঘুম মানায় না তোমাকে এখন ।
কত সূর্য্য অভিশপ্ত রাত
পার হ'য়ে এসেছি আমরা—
কত বিনিদ্র অসহ্য মুহূর্ত ।
কল্লোলিত সমুদ্র কেঁদেছে আমাদের পায়ে পায়ে
বালি-মাখানো অন্ধকারে ;

দিগন্ত-বিস্তৃত তৃষ্ণায় কেঁপেছে মরুভূমি
আর অরণ্য—
অতর্কিত হিংসায় মৃত্যু-কণ্টকিত অরণ্যের
অদ্ভুত আর্তনাদ আমাদের ঘিরে।
পার হয়ে এসেছি আমরা
সময়ের উড্ডীন পাখায়
অসহ্য সব মুহূর্ত।
এখন ঘুম তোমাকে মানায় না।
তোমার দৃষ্টির মানে আমি বুঝি
যুদ্ধ-বিরতির আস্বাদ লেগেছে তোমার চোখে।
নির্ব্বাসিত নক্ষত্রদের কাতরতায়
অবসন্ন তোমার স্মৃতি;
সমস্ত অতিক্রান্ত অন্ধকার তোমার স্নায়ুতে সঞ্চিত
তুমি শিথিল।
তবু ঘুম তোমাকে মানায় না এখন,
এই তো বাসব!

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঘরোয়া

উঁচু আঙুরের ঈষৎ আশাও করি না.
লক্ষ্য রেখেছি স্বনামধন্য ধ্রুবকে,
উদাসী হৃদয় সুলভেই পাবে, হরিণা
রূপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রূপকে।

খুসি আমাদের, দিবানিদ্রার বদলে
রেডিয়ো তাড়াবে দুপুর মহিলা-আসরে,
ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সদলে,
নাটক জমে না ও-সংক্ষিপ্ত আদরে?

শুনি বটে, পাঁঠা যোগ্য প্রেমের প্রসাদী
চালাও, শ্রীমতী, বৈজয়ন্তী অবাধে
স্বেচ্ছায় পাবে যুবক সলিল-সমাধি,
দীর্ঘ আড্ডা জমবে জনপ্রবাদে।

কৃত্রিম হ্রদ পায়চারি করি চলো না ;
মনান্তরের ঘটনা নেহাৎ ঘরোয়া,
প্রকাশ্যে হোক পরস্পরকে ছলনা
লোকলোচনকে অন্তত করি পরোয়া।

সংশোধনেব পথ বাৎলেছি শুঁড়িকে,
নাস্তিক নই, নিষ্ঠা সটান্ ত্রিশূলে,
মার্জ্জনা সব, ছুঁয়েছি যখন বুড়িকে
নিঃসন্দেহ স্বর্গ, শরীর মিশুলে।

বনগমনেব বয়সটা নয় নিকটে,
নির্ব্বাণ লোভে মঠ তো সঠিক, সময়ে
অসীম সিন্ধু মাপি আজ এক বিঘৎ-এ,
নিজ গুণে সেই ত্রুটি সামান্য ক্ষমো, হে।

মানি অহিংসা, জেনেছি অসহযোগিতা,
নায়ক অধুনা'কংগ্রেসি মনোনয়নে,
সাহিত্যে সখ, পড়ি না ভ্রষ্ট কবিতা
শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে।

জনান্তিকেই বলি কপ্‌চানো খাসা তো,
চতুষ্পদেই তীর্থ করেছি যোজনা,
বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাতো,
সেইদিন ভেবে আমাদের অনুশোচনা।

সম্মতি নেই মজুর ধর্ম্মঘটেও
ভাংচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি ভাড়াটে
মাথা ঘামাবো না চেক্ চীনা সংকটেও,
তবেই দেখবে ঈর্ষ্যা বাড়বে পাড়াতে॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট্ অবলম্বনে

XXXI

(Thy bosom is endeared with all hearts)

ও-প্রেয় বক্ষের মূল্য বৃদ্ধি করে তাদের হৃদয়,
যাদের সাড়া না শুনে মৃত ব'লে হয়েছিলো মনে,
ভস্মীভূত বান্ধবেরা ও-রাজত্বে পেয়েছে আশ্রয়,
ওর যুবরাজ প্রেম পরিবৃত প্রিয় পরিজনে।
মোর নত নেত্রে হতে যত পুণ্য অশ্রুর প্রণামী
প্রণয়ের পুরোহিত হরিয়াছে মৃতের উদ্দেশে,
সেই অপহৃত দান ব্যর্থ নয়, জানি আজ আমি,
লুকানো আছে সে-বিত্ত ও-বক্ষের গূঢ় নিরুদ্দেশে।
তুমি সে-উৎকীর্ণ চৈত্য মৃত প্রেম সংরক্ষিত যেথা,
পলাতক প্রেমিকেরা জয়পত্র লিখে গেছে তাতে,
আমারে বণ্টন ক'রে নিয়েছিলো যে-সব বিজেতা,
তাদের ভুঞ্জিত কলা অবিকল আবার তোমাতে।
তাদের বাঞ্ছিত মূর্তি আজ আমি তোমাতে নেহারি,
সবি তব প্রাপ্য, তুমি তাহাদেরি উত্তরাধিকারী।

স্বপ্ন-কামনা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।
ত্রিশঙ্কু-মদন : মণীন্দ্র রায়।
পটভূমি : অনুপম গুপ্ত।

আমার এক বন্ধু অধিকাংশ নবীন কবির কাব্যের উপরে একটি মন্তব্য লিখে রাখেন : Get married. রুদ্ধরতি কবিতার মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে, একথাটি অন্তত শ্রীমণীন্দ্র রায় স্বীকার করেছেন। হয়ত অনেক মূল্যবান কবিতার মূল শেষ পর্য্যন্ত নিরুদ্ধরতি ; কিন্তু মূল জিনিষটি কী ভাবে প্রকাশ লাভ করে তার

উপরেই সমালোচকের দৃষ্টি থাকা উচিত। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এবং মণীন্দ্র রায়ের কবিতা পড়ার সময় অনেক পরিচিত কবির কথা মনে আসে; সেটার জন্য যতটা দায়ী প্রথম প্রয়াস, ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ততটা নয়। কিরণশঙ্কর নারীদেহের উপর বেশী মনোযোগ দিয়ে তবু কিছু স্বকীয়তা আনতে পেরেছেন, শেষের দিকে ভাষা ব্যবহারে তিনি অপেক্ষাকৃত অবহিত হয়েছেন। গদ্যের চেয়ে ছন্দেই তাঁর হাত ভালো। কিন্তু এ-ধরণের কবিতা সরল ভাষায় কী উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন ?—

মাঝে-মাঝে মাঝরাতে নিশার প্রহরে
নিদ্রাদেবী নির্য্যাতন করে।

* *

ওদিকে যতো যুবকেরা বধূ ছেড়ে বসে অন্য ঘরে
সুরা আর নারী লয়ে মাঝরাতে মাতামাতি করে;
হাত ধরে টান মেরে আচমকা কাছে টেনে আনে,
হেসে ওঠে হো-হো ক'রে—চুমো খায় চাঁদমুখ পানে।

মণীন্দ্র রায় মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাডিশনে লিখেছেন ব'লে এ ধরণের অধঃপতন তাঁর কখনো হয়নি। যে সব কবিতায় এঁরা দুজন খুব বেশী ব্যক্তিগত নন, সেগুলোই আমার ভালো লাগল, যেমন কিরণশঙ্করের "জাতিস্মর" এবং মণীন্দ্র রায়ের "মুক্তি"।

অনেক স্থবির রাত্রি, ক্লান্ত সন্ধ্যা তিক্ত দীর্ঘ দিন
আর বহু উষাকাল, মধ্যাহ্নের বন্ধ্যা দাবদাহ
স্পন্দিত জীবনে এসে স্নায়ু সবি করে গেছে ক্ষীণ,
হৃদয়ে এনেছে যতো দয়া আর মৃত্যুর আগ্রহ।

(জাতিস্মর)

নয়নে নেমেছে আজ
বিষণ্ন জ্যোৎস্নার যত তন্দ্রা কোলাহল।
কল্পনার স্নায়ু কাঁপে মনে।
সুদূর বিস্মৃত পারে নতুন পৃথিবী এক হয়েছে উতল
আমার বিহঙ্গ স্মৃতি স্খলিত কূজনে
ভরে দেবে তার বনতল।

(মুক্তি)

বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে থেকেও শেষ পর্য্যন্ত স্বকীয় পথ খুঁজে নেবার সামর্থ্য এঁদের আছে, এবং ভবিষ্যতে তার পরিচয় আশা করি পাবো।

'পটভূমি' নামটি জাঁকালো, কিন্তু ভিতরের কোনো কবিতাই উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েকটি জিনিসের তালিকা দিলেই সমাজবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না, এ সহজ সত্যটি শ্রীঅনুপম গুপ্ত ভুলে গিয়েছেন। তাঁর এই ক্যাটালগ করবার অভ্যেসের জন্যেই রচনাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি, নয়তো দু-একটি লেখা কবিতার পর্য্যায়ে এসে পোঁছতে পারতো। এই পুস্তিকাটিতে কখনো-কখনো অনুভূতির সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু শব্দপ্রয়োগ শিথিল ও ছন্দ অন্যমনস্ক ব'লে সে-অনুভূতির প্রকাশ পঙ্গু। কবিতার শিল্পকলা আয়ত্ত করতে পারলে এই লেখকের প্রচেষ্টা হয়তো অসার্থক হবে না।

সমর সেন

বুদ্ধদেব বসু

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল সারি
বৃষ্টিতে ধূমল, পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি, মেঘ-ঘন অন্ধকার, দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী, তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি, প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।

তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সংক্রাম

তোমার আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না ;
কবিতাপ্রভব ক্রৌঞ্চ আমাদের উপমান নয় ;
সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভূষণেরও ব্যবধি রহে না ;
বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরব্যয়, আদ্যন্ত সান্বয় ॥

অনাথ বিশ্বের ধ্বংসে মরুভূর নিত্য সমভাব ;
অবিবেকী অন্তর্যামী ; স্ত্রী-পুরুষ অন্যোন্যনির্ভর ;
নিতান্ত পশেনি আজও যে-নৈমিষে পিশাচী প্রভাব,
সেথাও অনন্ত সিদ্ধি ঊর্দ্ধশ্বাস প্রেয়সীর বর ॥

তবুও নিশ্চয় জানি ওমরের তত্ত্ব নিরর্থক।—
মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার ;
প্রস্তরিত পদচিহ্নে ধরা পড়ে উধাও নর্ত্তক ;
নিবিদ মর্ম্মরে জ্বলে অঙ্গারিত আদিম কান্তার ॥

স্পৃষ্ট, দৃষ্ট ত্রিভুবন ব্যাজজীবী কালের কবলে ;
পলায়ন শশবৃত্তি ; লুপ্তি, গুপ্তি পরিহাস, শ্লেষ ;
সে-উন্নিদ্র ত্রি লোচনে ভেদ নাই ধবলে শবলে ;
অনুজের গলগ্রহ অগ্রজের নিভৃত আশ্লেষ ॥

তাই কি বিচ্ছেদ ঘটে বারম্বার বাহুর নিবীতে ;
প্রিয়সম্ভাষের ফাঁকে শোনা যায় দূর আর্ত্তনাদ ;
সঙ্কুচিত নিরালয় অবরোধ করে চারি ভিতে ;
আবহে বিষাক্ত বাষ্প ; সংক্রমিত স্বয়ং কণাদ ?

বিষ্ণু দে

কোনো কম্‌রেডের বিবাহে

নব অলকার স্বপ্নমায়া
উল্কা ছড়ায় তারায় তারায়।
রচনায় তবু পড়ে তো ছায়া—
হৃদয় যদিই তোমাকে হারায়!

চোখ মেলে দেখি ভাঙা ও গড়া,
মেলাই মেলায় আপন সুর।
আগত পুলকে ক্রমেই চড়া
মিলিত কণ্ঠে প্রাকার চুর্।

এল কি সিদ্ধি! খোলে কি দ্বার!
জনতাদীপ্ত চলি সবল।
তবু দ্বিধা, ভাবী অন্ধকার
যদি দূরে যাও, কালের ছল!

নব অলকার স্বপ্নমায়া
জানি খুলে' দেবে আলোক দ্বার।
তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,
হৃদয় আমার! হৃদয় যার।

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আলাপ

আবার বসন্ত

তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কম্‌রেড?
বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে।
পর্দায় সর্দার হাওয়া কস্‌রৎ দেখায়।
আকাশে অসংখ্য টর্চ। মেঘেরা ফেরার।
গোলদীঘির গর্ত্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।

বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে?
বছর-বছর দেখা দিয়েছে তো ক্যাম্বেলের ভিড়ে।

পণ্ডশ্রম

কয়েকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে—
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু খোঁজা ক'রে
নীলাকাশে, অন্ধকারে গৈরিক নদীতে।
তারপর আত্মহারা অধিক রাত্রিতে
যে-কারো ইঙ্গিতে নাড়া দিয়েছি যখন—

তখনি পিছন থেকে বলেছে বিদায়
ভগ্নমনে সচ্চরিত্র গুপ্তচর কোনো।

অশোকবিজয় রাহা

ফাল্গুন

ছিটকিনি নড়ে উপরের জানালায়
একটু কবাট ফাঁক
চুড়ির ঝিলিকে একটু আলোর চিড়—

দুইখানি সাদা হাত :
দুইটি কবাট দুইদিকে সরে যায়
গোধূলির আলো পাখা ঝাপটায় চোখে মুখে বুকে এসে,
ধু ধু হাওয়া খেলে এলোচুলে পর্দায়।

নদীর ওপারে আকাশে আবির-ঝড়
আল্‌তা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া
ধু ধু হাওয়া এলো চুলে

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ঝিনুক

নানা রঙের ছিটলাগা
একটা ঝিনুক পেয়েছি কুড়িয়ে
চমৎকার দুটি খোলা।
ভাবছি এর আড়ালে এমন কিছু কি লুকিয়ে নেই
যা চমৎকার-তর ?

ভেঙে দেখলে হয়।
কিন্তু ভয় হয় ভাঙতে,
কি থাকবে কি জানি
হয়তো কিছুই থাকবে না
খোলা দুটিও যাবে।

তার চেয়ে ভীরুতার আড়ালে
ঢাকা পড়ে থাক আমার লোভ,
খোলার আড়ালে
বিচিত্র সম্ভাবনা।

অমিয় চক্রবর্তী

চীনে বুড়ো*

মাটির বুকের কাছে থাকার ফল ?
বুড়োর মুখটা চাষকরা রৌদ্রপড়া শীতবসন্তের কুঞ্চিত মাঠ,
আসল যা জীবনের তারি ঘনতা ধরেচে ললাট ?
না, গাছপালার মতো সহজ, সহজাত সরল, এই ফল
উঠেচে বেড়ে, পেকেচে চুল, মুখের মহিমা
যেমন ধান, সবুজ শীষ, জলের প্রসন্ন ভঙ্গিমা ?
চীনে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ভাবি : গম্ভীর শান্ত প্রাচীন
ছুপিয়ে দেওয়া চেহারা কালের না বহুকালের ?
ভদ্র সভ্যতার সকালের
রক্তে বয়ে-আসা আলোয় হঠাৎ এসেচে কোন্ দিন
এই চলন্ত ট্রেনে ? পোঁটলা বিছানা নিয়ে ভিড় উঠ্‌ল
রাস্তার ধারে ছোটো স্টেসনে থেমে ট্রেন ছুট্‌ল
দুপাশে চীনে পাহাড়, চীনে গাছ, অচেনা বাঁকা ছাত-
বাড়িতে আমার আবিষ্ট চোখ,
দৃশ্যে চারিয়ে গেছে সহযাত্রী চাষীর স্নিগ্ধতা—এই বৃদ্ধ লোক ॥

অমিয় চক্রবর্তী

কোথায় চলেছে পৃথিবী

তোমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।

* অড্রে হ্যারিসের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে'।

সমস্ত সংসার
হাওয়া
উঠচে নীল ধুলোয় সবুজ অদ্ভুত ;

দিনেব অগ্নিদূত,
আবাব কালো চক্ষে বর্ষার নামে ধাব।

কৈলাস মানস সরোবব
অচেনা কলকাতা সহব

হাঁটি ধারে ধাবে
ফিবি মাটিতে মিলিয়ে।

গাছ বীজ হাড স্বপ্ন আশ্চর্য্য জানা
এবং তোমাব আঙ্গিক অমোঘ অবেদন
আবর্ত্তন

নিয়ে
কোথায চলেচ পৃথিবী।
আমাবও নেই ঘব।
আছে ঘবেব দিকে যাওয়া॥

বিষ্ণু দে

একটি প্রেমের কবিতা

তাবাব দল উধাও নিজ বেগে।
পাহাড ওডে নীল যেখানে সাদা।
লক্ষ হাতে প্রাণ ছডায় কাদা
এই পৃথিবী গতিব ঢেউ লেগে।

সবুজ বট ছায়া বিলায় বটে,
নীলেই তার হাজারো হাতছানি।

শুশুক মাতে নীল সাগরে জানি—
প্রেম আমার পাড়ায় নাকি রটে ?

হৃদয়, প্রিয়া, দিয়েছি দুই হাতে।
প্রাণের লীলা তোমারই, সঙ্গিনী।
তোমাকে আমি মাত্রা বলে চিনি!
তোমাতে প্রাণ প্রাণের সমে মাতে।

চলেছি ছুটে দেশকালের নীলে,
বাইরে ঘর স্বার্থে ভয়ে মেশা,
আগুননাসা ঘোড়ারা ছোঁড়ে হ্রেষা!
তোমাকে বাঁধি সঙ্গতির মিলে।

প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে
উল্কা, প্রিয়া, থমকে নিজ বেগে॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জাতক

১

উন্মুক্ত আকাশে শুনি চমৎকৃত চিলের চীৎকার;
দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ডেকে ওঠে শিকারী নকুল;
গুপ্ত ছত্রাকের ফুলে সমাচ্ছন্ন শোষিত বকুল;
উদ্গ্রীব ঝাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার॥

অপমৃত ভগবান; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসার প্রতুল:
অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম্ম আত্মীয়সংহার॥

অভিসার, অভিযান এ-আবহে নিতান্ত সমান :
স্বসমুখ বিসংবাদ : কুরুক্ষেত্রে অগত্যা সঙ্কেত ;
এখানে আর্ত্তের লোভ শিবাভুক্ত শবের আয়ুধে ॥

অর্দ্ধনারীশ্বর নয়, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্বে ম্রিয়মাণ :
মিথুন নিমিত্তমাত্র, কর্ম্মকর্ত্তা প্রতিযোগী প্রেত :
তুমি, আমি সর্ব্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে ॥

২

অথবা পিশাচ স্বদ্ধ গৃধ্নু ইতিহাসের ঘাতক ;
এবং সে-ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্পস্বরূপ।
ফলত যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ,
তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন পাতক ॥

অর্থাৎ কৈবল্য স্বপ্ন : জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্যবাধক ;
অনুবন্ধী শাস্তি-শান্তি ; একান্তর উল্কা ও ধূপ ,
নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্গেব মধুপ :
পুণ্যাত্মারা পরকীয় দায়িত্বের সংক্রান্তিসাধক ॥

কারণ বিচারক্ষম নয় অন্ধ, অনাথ নিয়তি
তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক :
প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত পুরস্কৃত গচ্ছিত ভূষণে ॥

সুতরাং নির্দ্বন্দ্বও নির্ব্বন্ধের বিপরীত রতি :
বরঞ্চ দ্বৈরথ ভালো, গুপ্তহত্যা শুধু সাংঘাতিক :
আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে ॥

জীবনানন্দ দাশ

রাত্রি

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্র্যাণ্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মত জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক্‌ স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে,
চীনেবাদামের মত বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রৎ পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে,
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে,
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মত।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব্ব,—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

যামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইওরোপীয়ান আঙ্গিকে। তাই তাঁর ছবি বুঝতে হলে প্রথম জানতে হবে আধুনিক ইয়োরোপীয় ছবির আসল সমস্যা ও উদ্দেশ্য কী।

একজন ইয়োরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পী একবার তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে এই মূর্ত্তিগুলি যদি পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় তবে হয়ত ভেঙেচুরে কিছু প্রাণ আসে। অর্থাৎ ইওরোপের শিল্পীরা রিয়ালিজম-এ ক্লান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নতন একটা পথ। তাঁরা দেখছেন শিল্পের অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ হয়েছিল আদিম যুগেই। তখন শিল্পের উপর সভ্যতার আবরণ দেবার চেষ্টা হয়নি, ঝোঁক পড়েনি ফোটোগ্রাফিক ফাইডেলিটির দিকে। বিষয়বস্তুর সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। ফলে কোনো গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবিতে যখন দেখি একটা ঘোড়া আঁকা হয়েছে বুঝি যে ওটা ঘোড়াই কিন্তু এই ঘোড়া বা ওই ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মত নিখুঁত বর্ণনা তাতে নেই। অর্থাৎ ঘোড়ার মূল কথাটা আছে শুধু। তারপর সভ্যতা যত এগুতে লাগল তত ঝোঁকটা পড়ল রিয়ালিজম্-এর দিকে। মানুষ নিজের নগ্ন দেহ নিয়ে কুণ্ঠা পেল, খুঁজল আবরণ ও আভরণ আর তাতে প্রত্যহই বাড়াতে লাগল কৃত্রিমতার বোঝা। শিল্পীও ঠিক একই ভাবে নগ্ন ভাবাবেগে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন, নিখুঁত করার চেষ্টা, পালিস করার চেষ্টা এদিকেই পড়ল নজর। পালিশ

হল, কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ল। গঠন বা গড়নটা গেল হারিয়ে। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প হাঁপিয়ে উঠল। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান সুরু করেছেন এই রিয়ালিজম্-এর বিরুদ্ধে। পালিস ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও, এই হল তাঁদের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে তা হলে কি আজকের শিল্পের কোনো তফাৎ নেই? আছে নিশ্চয়ই, কারণ শিল্পের এই হলো ইতিহাস, এর উদ্দেশ্যে ভ্রান্তি থাকলেও এটা সম্পূর্ণ অনর্থক নয়। কারণ, একদিক থেকে এর প্রকাণ্ড একটা শিক্ষা-মূলক মূল্য আছে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি ছিল অবচেতনার স্তরে; তখনকার শিল্পীরা যে সত্যের আভাস পেয়েছে তা নিতান্তই আকস্মিক। পাহাড় থেকে গড়িয়ে প'ড়ে কোনো মূর্ত্তি যদি প্রাণের সন্ধান পায় সেটাও হবে আকস্মিক। এই অবচেতনা ও আকস্মিক-সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হল আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্য, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য্য প্রয়োজন শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ শিল্প যতদিন রিয়ালিজম্-এর ভ্রান্ত মোহে ঘুরেছে ততদিন ধ'রে ঘোরার ব্যাপারে অনেক অনিবার্য্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল: যেমন, ড্রয়িং, রং বা সামঞ্জস্যের দিক। একমাত্র এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের উদ্দেশ্যকে অবচেতনের স্তর থেকে চেতনার স্তরে আনতে পারা যায়। তাই দেখতে পাই আজ ইয়োরোপে যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রথমে কী পরিশ্রম করেছেন রিয়ালিস্টিক ছবির আঙ্গিককে দখল করতে; অথচ মজার কথা, উদ্দেশ্য এই রিয়ালিস্টিক ছবিকেই ভাঙা: পিকাসো, মাতিস, সকলেরই—হবেই বা না কেন? আইন অমান্য যিনি করতে চান তাঁকে ত প্রথম হতে হবে আইনের ব্যাপারেই পাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্য্যই হয়, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এ দিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রং-এর কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই: অনভিজ্ঞতার ক্রটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই ব'লে কল্পনার প্রাবল্য সব সময় সমান সজাগ থাকে না, এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়ত তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন

ধরুন তাঁর "খাপছাড়া"র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক বা চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ রিয়ালিষ্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারে নি।

তা ছাড়া রিয়ালিজম্-এর এই যে ছোঁয়াচ তা কি আধুনিক ইয়োরোপীয়ন্ শিল্পই সম্পূর্ণ এড়িয়ে আসতে পেরেছে? আমার ত মনে হয় আজও তা পারে নি। পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝছেন ডাইমেনশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে ব'লেছিলেন "এঁদের নতুনত্ব কই দেখছিনে কিছু। আমি না-হয় আঁকতে চেয়েছি আস্ত একটা পেয়ালা আর এঁরা সেই আস্ত পেয়ালাই আঁকছেন ভেঙে চুরে। নতুনত্ব কোথায় তা হলে?" কথাটা অনেকখানিই সত্যি। সত্যি বলতে, সেকেলে রিয়ালিষ্টিক চিত্র-কলায় ও অতি-আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় **দৃষ্টির** কোনো তফাৎ নেই। আমার মনে হয় চীন বলুন, জাপান বলুন, সারা জগতে শিল্পীর দৃষ্টি একই, ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়া এ ভাবে আর কেউ কাটাতে পারে নি। পুরাণের একটা ভাবচ্ছবি ধরুন না—জটায়ুর সঙ্গে বাস্তব পাখির কোনো সম্পর্ক নেই, এর জন্ম-ইতিহাসও অদ্ভুত, সেখানেও রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ এসে পড়ে নি। কিন্তু জটায়ু ব'লে একেবারেই চিন্‌তে পারেন না কি? পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ হল চিন্তারাজ্যের পাখি, রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ একেবারে নেই। আমার ত মনে হয় যেদিন আধুনিক শিল্পী শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকতে পারবেন, সেদিনই আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পের আদর্শ পরিপূর্ণ হবে। আমার বিশ্বাস আজ শিল্প এই রকমই কোনো পৌরাণিক জগত সৃষ্টি করার দিকে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরণের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি অ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার কোনো ছবিতে অ্যানাটমিবোধ যদি সত্যই থাকে তা হলে শুধু এই ধরণের ছবিতেই আছে। কারণ, ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য্য কতটুকু? এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশী আর কী? শরীরের

পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য শিল্পেই কি এই সতেজ ভাব সবচেয়ে বেশী বর্ত্তমান নয় ? রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনি নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দু'শ বছর ধ'রে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে-অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান: ছবির জন্যে খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কী বলতে চাই বোঝাতে হলে দুটো ছবির তুলনা করা ভাল। ধরুন দু'জন শিল্পী একটি মেয়ের ছবি আঁকতে চান নিছক কল্পনা থেকে—অর্থাৎ দুজনেই আঁকতে চান না-দেখা মানুষ। একজন এই না-দেখাকে আঁকছেন নিতান্ত ঘরোয়া ক'রে নিয়ে, কল্পনার প্রসার সেখানে নেই। আর-একজন মেয়েটিকে আঁকছেন, তাওনা দেখেই, কিন্তু তাকে দেখার গণ্ডীর ভিতরে টেনে আনার কোনো চেষ্টাই নেই। কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার স্পষ্ট ধরা পড়ে, বৃহৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। কথাই একটু বুঝিয়ে বলি। পোর্ট্রেট দেখে-দেখে আঁকা হয়, তাই বিজ্ঞানী ব'লে দিতে পারেন মডেল শিল্পীর কত ফুট দূরে কত ইঞ্চি নিচে বসেছিলেন, কোন দিক থেকে আলো পড়েছিলো, ইত্যাদি। দেখে দেখে যখন মানুষ আঁকি তখন তার মুখ যতক্ষণ আঁকি শুধু মুখই দেখি, আর কিছু দেখি না, আবার দেহের নিম্নাংশ আঁকবার সময় মুখ দেখি না, শুধু নিম্নাংশই দেখি। একই মানুষ দশ ফুট দূরে দাঁড়ালে একভাবে দেখি, একশো ফুট দূরে দাঁড়ালে দেখি আর-একভাবে, দুশো ফুট দূরে গেলে আবার অন্যভাবে দেখি। কিন্তু সেই মানুষই যখন দৃষ্টির বাইরে চ'লে যায়, তখনো কি তাকে দেখি না ? তখনো তাকে দেখি, দেখি সম্পূর্ণভাবে, তার সেই চোখে-না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আজকের মানুষ, তাই বিশেষ কোনো পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা তার নেই। তাঁর ছবিতে এই বিশেষত্ব সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার যে আলোচনা হয়েছিল, এখানে তা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন, আমার ত আর আর্টস্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়ত সম্পূর্ণ ই হয় না। আমি বল্লুম, এগার বছর স্কুলে পড়েও ত দেখি

ছেলে অনেক সময়ই মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনোদিন স্কুলের কাছ ঘেঁষে নি এমন ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি—ছবির বেলায় আপনারও হয়েছে তাই।*

† 'চিত্রলিপি'. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৪॥০ ও ১০৲

* শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস

কল্যাণীয়েষু,

বুদ্ধদেব, কাল তোমার সঙ্গে যখন সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম তখন আমি মনে মনে বরাবর জানছিলুম যে অত্যুক্তি করছি। এ রকম জেনে শুনে অত্যুক্তি করার কারণ এই যে, ভেতরে কোনো এক জায়গায় বিরক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত একথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নই—কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়। একবার যাওয়া যাক্ কবিজীবনের গোড়াকার সূচনায়।

শীতের রাত্রি—ভোর বেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমাদের ব্যবহার গরীবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই ছিল না। গায়ে একখানা মাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছয়টা পর্যন্ত গুটিসুটি মেবে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিদ্র। তার প্রধান সম্পদ ছিল পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে এক সার নারকেল গাছ। সেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমাব এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হোত তাহলে সর্বজনীন বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদের থেকে এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ এইটে

জানতে পারলে আর কোনও ব্যাখ্যার দরকার হোত না। কিন্তু কিছু বয়স হ'লেই দেখতে পেলুম আর কোনও ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার জন্য এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়তো না তা আমি দেখলুম। শুধু তাদের কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করতো। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকতো তাহলে সকাল-বেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেতো, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ত দৃশ্যটাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে,—সে এই-খানেই। স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটার সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার উর্ধ্বে ঘন নীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখে নি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস। এই গাধাগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়—এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনও ব্যতিক্রম হয়নি আদি-কাল থেকে। আর একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল, আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চিত জানি সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনও লোককে এই দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে ব'লে দেয়নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে বৃটিশ সাবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে বাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্নমেন্টের বাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনও রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানা ভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষদে আছে, "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি"। আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তাই পুত্রস্নেহ তার

কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপ প্রকাশ করে। অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ "কথা ও কাহিনী"র গল্পধারা উৎসের মত নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষার এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল সুতরাং বলতে পারা যায় "কথা ও কাহিনী" সেইকালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই "কথা ও কাহিনী"র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত—বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হোত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরিলুট প'ড়ে যেতো। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ সকল চিত্র ঠিক এমন ক'রে দেখতে পায়নি। বস্তুত তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টি-কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলা দেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ করেনি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনা-শালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহে তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চ'লে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনও সামন্ততন্ত্র নয় কোনও রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের

মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো আনা পরিমাণে আমি জানিই নে। বোধ করি সেইজন্যই আমার বিশেষ ক'রে রাগ হয়। আমার মন বলে দূর হোকগে তোমার ইতিহাস। হাল ধ'রে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখ-দুঃখকে যে আত্মসাৎ ক'রে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হোলো না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা-মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগ যুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটেকেই বড়ো ক'রে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে—মানবের আত্মার কেন্দ্র-স্থলে। আমাদের উপনিষদে এ-কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি—সে আমিই করেছি. তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব। তাই তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।

২

সৃষ্টিকর্তার নানা দান মানুষের জীবনের পাত্র পূর্ণ ক'রে চলেছে। সে সমস্তই তার প'ড়ে পাওয়া। মানুষ তাতে খুশি হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন কিছু চায় যা তার আপনার জিনিস, ধার করা নয়। সৃষ্টির থেকে মানুষ পেয়েছে আপনার ধন, কিন্তু একটা বাড়তি জিনিস পেয়েছে সে হচ্ছে তার আপন মন। সে কেবলই চেয়ে এসেছে যা তার মনের মতো, যা পেয়েছে তার সঙ্গে মেলে না। এই মন কেবল যে চেয়েছে তা নয়, সে যা চায় তা বানিয়েছে। কেননা, যা সে চায়, যা পেলে তার ভাণ্ডার পূর্ণ হয় তা বাইরে নেই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার ক্ষমতা আছে, ভিতরের থেকে ফলিয়ে তোলে। মানুষের সমস্ত ইতিহাস এই দুই ধারায় অঙ্কিত। এক হচ্ছে —যা তার প্রয়োজন—সে পায় প্রকৃতির নিজ হস্তের পরিবেশন থেকে, তার খাদ্য তার গুহার আশ্রয়, তার নানা কিছু জীবিকার উপকরণ। এই প্রয়োজনের বস্তু প্রচুর তার ভাণ্ডারে, যার অনেক আছে, যথেষ্ট আছে, সে ধনী, যার যথেষ্ট জোটেনি সে গরিব। কিন্তু তবুও প্রয়োজনের সন্ধানে মানুষের দিনরাত্রি তো কাটেনি। সে তার প্রয়োজনের উপকরণকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ও সব সঞ্চয়ে একেবারেই নেই, যা তার

* এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের ('সাহিত্যের উৎস') চুম্বক 'সাহিত্য, শিল্প' নামে গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিলো। উভয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যদিও এক, এটি বিস্তারিত-ভাবে লেখা, এবং কবির সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতে হ'লে এটি পড়া দরকার।—'কবিতা'-সম্পাদক।

মন চায়, যাতে তার প্রাণের দরকার। এই মন-চাওয়া জিনিস নিয়ে তার খুব একটা দ্বন্দ্ব চলে। কিছু মনের মতো হ'য়ে উঠেছে, কিছু বা হচ্ছে না। জীবনে যা পাইনি তারই রূপ কিছু বা তার আপন সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে, কিছু বা অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। এই তার প'ড়ে পাওয়া জীবনেব পাশাপাশি মানুষ কেবলই আপন মনের মতো সরঞ্জাম সাজিয়ে তুলছে। মানুষ যা আপনার জীবিকার উপকরণ সঞ্চয় করেছে তাতে আপনার পরিচয় নেই—সে বাইরের জিনিস। মানুষ যা আপনার অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে তার লীলাক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছে, যাকে অনায়াসে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে, তাতেই তার যথার্থ পবিচয়। সর্বকালেব সর্বদেশের ইতিহাসে মানুষ আপন সঞ্চয়-ভাণ্ডারের পাশাপাশি আপন পরিচয়-প্রসাবের প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেছে। সে আপন মনের মতোকে গ'ড়ে তুলে যথার্থ আপনাকে দেখতে পেয়েছে। সেই তার পরিচয় কোথাও বা সুশোভন হয়ে উঠেছে, কোথাও বা তা বর্বর। কিন্তু এই তার আর্ট, এই তার জীবনের স্বরচিত দ্বিতীয় ধারা। এই অপ্রয়োজনীয়ের প্রকাশ দেখেই আমরা মানুষকে বাহবা দিই। বলি, যে-মনের মতোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকেই নানা জাতির কীর্তির মধ্যে নানা আকারে দেখতে পাচ্ছি। যাকে দেখে খুশি হই, তাকে দেখতে পাচ্ছি তার সাহিত্যে তার কলানৈপুণ্যে তার নানা অনুষ্ঠানে, যেখানে মানুষের পরিচয় অবিনশ্বর। যাকে দেখে ধিক ধিক বলি তাকে এই শিল্পশালায় আমরা খুঁজিনে। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে সর্বত্রই এই সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, যার থেকে দেখতে পেয়েছি কী তার মনের মতো। তাকে বলতে পারো ওসব তো বানানো, ওসব তো ছেলেমানুষি, কিন্তু মানুষের মধ্যে চিরকালের ছেলে-মানুষ জয়ী হয়েছে তার কাব্যে তার গানে, তার রচিত মূর্তিতে, তার চিত্রকলায়। মানুষ ধনীর ধনকে অবজ্ঞা করতে পেরেছে কিন্তু গুণীর কীর্তিকে পারেনি। এই তার প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের যুগল মিলনে মানুষের সম্পূর্ণতা। আশ্চর্য এই সম্পূর্ণতার বিচিত্র রূপ। যে সৃষ্টিকে তুমি আধুনিক বলো বা সনাতনী বলো তার প্রধান প্রেরণা তাই, আর তাই নিয়েই তার আত্মসম্মান। যদি সে এমন কিছু হয় যা চিরকালের মানুষের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত, যা কদর্যের স্বরূপ দেখে রস পায় —বলে বাহবা, তাহলে বুঝবো মানুষের আর্টের সঙ্গে যথার্থ মহিমার কুৎসিত বিচ্ছেদ ঘটেছে। মানুষের জীবনের সম্পূর্ণতা রচনায় তার ফল যে কী তা ক্রমে ক্রমে দেখা যাবে। কিন্তু সেই দুর্দিন যত দূরে থাকে ততই ভালো।

উদয়ন

২৪।৫।৪১

বিষ্ণু দে

এলিয়েটের কবিতার অনুবাদ

চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া

চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া
লাফিয়ে উঠল, ভাঙল ঘণ্টাঘড়ি
জীবনমরণে দোদুল্যমান হাওয়া
হেথা, মরণেব স্বপ্নরাজধানীতে
অন্ধ দ্বন্দ্বে জাগল প্রতিধ্বনি
এ কি স্বপ্ন কিম্বা অন্য কিছুই হবে
কালো নদীটার রূপে যবে মনে হয়
অশ্রুর ঘাসে ভিজা সে কারো বা মুখ ?
দেখেছি সে কালো নদীর অপরপারে
ছাউনি-আগুন নাচায় বর্শা কত
হেথা, মরণের অপর নদীর পাবে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত ॥

জীবনানন্দ দাশ

ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেল দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল ক'রে নিতে গেল নিজের সঞ্চারে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
ক'রে নিতে গেল—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে গেল তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীন দুয়ার

খুলে দিতে গেল দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেল ঘাসের মতন তার হাড।
সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীর ঘাস
ছ'মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

(শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে লেখা)

Uttarayan
Santiniketan, Bengal
২৫।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু,

এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমাব ছবি সম্বন্ধে তোমাব লেখাটি পড়ে আমি বড আনন্দ পেয়েছি। আমাব আনন্দেব বিশেষ কারণ এই যে আমাব ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষাব সাধনা কবে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমাব অধিকার জন্মেছে এ আমাব মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। আমাব ছবিব তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদেব মতো গুণীর সাক্ষ্য আমাব পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যাবিসের আর্টিস্টবা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমাব কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলিব সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশেব লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজেব দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বেব সঙ্গে প্রচার করা যায় আমাদের দেশে তাব কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্র সৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারে না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার

এই আবৃত্ত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এইজন্য তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ

'কল্লোল' ও দীনেশরঞ্জন দাশ

কয়েক মাস আগে দীনেশরঞ্জন দাশের মৃত্যুসংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকা সেই সব লেখকদের প্রথম লীলাক্ষেত্র, যাঁরা. আমার মতো, প্রায় পনেরো বছর আগে অতি-আধুনিকতার শীলমোহরে চিহ্নিত হ'য়ে আজ প্রায় অনাধুনিক হ'তে বসেছেন। গল্পসর্বস্ব সিকি-মূল্যের মাসিকী হিসেবে জীবন আরম্ভ ক'রে 'কল্লোল' যে ক্রমে নতুন লেখকদলের মুখপত্র হ'য়ে উঠলো তার পিছনে ছিলো গোকুল নাগের প্রেরণা, যিনি তাঁর হ্রস্ব জীবনের শেষ বছরগুলিতে 'কল্লোলে'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। গোকুল নাগকে আমি কখনো দেখিনি, তবে তাঁর রচনা প'ড়ে তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর নানা বিষয়ে তাঁর গুণপনার কথা বন্ধুদের মুখে শুনেছি। 'কল্লোলে'র গল্পসাহিত্যে বার-বার বর্ণিত যক্ষ্মামুমূর্ষু তরুণ শিল্পী যে একান্তই অবাস্তব নয়, জীবনে সত্যই যে ও-রকম ঘটে, যেন নেহাৎই ও-কথা প্রমাণ করবার জন্যে গোকুল নাগের শোচনীয় মৃত্যু। অতি তরুণ বয়সে দুর্দান্ত যক্ষ্মারোগে তাঁকে যখন গ্রাস করলো আমরা ভাবলুম এবার বুঝি 'কল্লোলে'রও সংকট উপস্থিত, কিন্তু দীনেশরঞ্জন 'কল্লোল'কে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখলেন তা নয়, নানাভাবে পূর্ণতর ক'রে তুলতে লাগলেন। তাঁর উৎসাহে নানাদিক থেকে নানা লোক এসে জুটলো 'কল্লোলে'র আসরে. প্রেমেন্দ্র মিত্র. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরো কয়েকজন নবীন ও সেকালে অজ্ঞাত লেখকের সানন্দ সহকর্মিতা তিনি যে পেয়েছিলেন সে তাঁরই যোগ্যতা। 'কল্লোল' সম্পাদনা ছাড়া আর-কোনো কাজ তিনি করতেন না, তাতেই ঢেলেছিলেন তাঁর সমস্ত সময়, সম্বল ও উদ্যম, এবং 'কল্লোলে'র আয়ু ঠিক তখনই ফুরিয়ে এলো, যখন সদ্য আগত দিশি সিনেমার চাকচিক্য তাঁর সময় ও মনঃসংযোগ খুব বেশি ক'রে দখল করতে লাগলো।

* এই পত্রে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে যামিনীবাবুর প্রবন্ধ 'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক।

ক্রমে 'কল্লোলে'র আকার বাড়লো, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নতুন লেখকরা তার পৃষ্ঠায় একে-একে দেখা দিলেন, তার খ্যাতি ও অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত দেশে। তখন আমরা যারা ও-পত্রিকায় লিখতুম আমরা সকলেই 'কল্লোলের দল' নামে পরিচিত ছিলুম, এবং আমাদের নিন্দুকরা যতই সংখ্যায় ও তেজে বর্ধিষ্ণু হ'তে লাগলো, আমাদের আনন্দও ততই যেন উথলে উঠলো, কারণ লোকে নিন্দে করলেও আনন্দ হ'তো এতই ছেলেমানুষ তখন আমরা ছিলাম। একটা সময়ে নিন্দার মাত্রা এতই চড়েছিলো যে সাহিত্যের কোনো-কোনো শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি বিচলিত হ'য়ে একটি সভার আয়োজন করেন যাতে 'কল্লোল' ও 'কল্লোল'-বিরোধী উভয় দল একত্র হ'য়ে একটা 'বোঝাপড়া'য় পৌঁছতে পারে। বোঝাপড়া হবার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না, কিন্তু সভাটি ঐতিহাসিক, কারণ সেটি হয়েছিলো জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে আর তার নায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই বিচিত্র সম্মিলন দু'দিন অনুষ্ঠিত হয়, আর দু'দিনই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজের কথা বলেন, তাঁর সেই মূর্তিটি আর সেই আশ্চর্য অনর্গল কথকতা এখনো চোখে ভাসে, কানে বাজে। তাঁর সে-সব কথাই অনতিপরে বিখ্যাত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের আকার নেয়। কিছুদিন পরে দেখা গেলো 'কল্লোল' দলের ঐকান্তিকতা আর থাকছে না ; শৈলজানন্দ আব প্রেমেন্দ্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসুর সঙ্গে আলাদা কাগজ বের করলেন 'কালি কলম', এদিকে অজিত দত্তের আর আমাব যৌথ সম্পাদনায় 'প্রগতি' দেখা দিলো ঢাকা থেকে। 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ ও তখন সদ্য সমাগত বিষ্ণু দে, ওদিকে 'কালি কলমে' জুটলেন মোহিতলাল, প্রবোধ সান্যাল ও জগদীশ গুপ্ত। নজরুল ইসলাম— তখন তাঁর সৃজনীদিনের মধ্যাহ্ন—তিনটি পত্রিকারই ঝুলি সমানে ভর্তি ক'রে চললেন। 'কল্লোল' তিন ভাগ হ'লো, কিন্তু 'কল্লোলে'র মূল লেখকদের তার প্রতি আসক্তি কমলো না। তাঁদের অনেকেরই অনেক ভালো লেখা অন্য পত্রিকা দুটির প্রলোভন সত্বেও 'কল্লোলে'ই বেরিয়েছে।

'কালি-কলম' আর 'প্রগতি' দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু 'কল্লোলে'র স্রোত যে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। 'কল্লোল' আর চলবে না এ-খবর যেদিন শুনেছিলাম সেদিন মনে যে-আঘাত পেয়েছিলাম, তার রেশ এখন পর্যন্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি। সেদিন মনে-মনে বলেছিলাম দীনেশ-দা মস্ত ভুল করলেন, আজও সে-কথা অভিমানে আর্দ্র হ'য়ে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। যদি 'কল্লোল' আজ পর্যন্ত চ'লে আসতো এবং এ-ক' বছরে

সমাগত নবীন লেখকদেরও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতো তা'হলে সেটি হ'তো বাংলা দেশের একটি প্রধান—এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম—মাসিকপত্র, আর দীনেশরঞ্জনের নাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক হিসেবে হয়তো রামানন্দবাবুর পরেই উল্লিখিত হ'তে পারতো। এ-কথা মনে না-ক'রে পারিনে যে এ-গৌরব দীনেশরঞ্জন ইচ্ছে ক'রেই হারালেন—বাংলা সিনেমা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্ষতি করলো 'কল্লোলে'র অপমৃত্যুর জন্য অন্তত আংশিকরূপে দায়ী হ'য়ে। সত্যি বলতে, আজ পর্যন্তও আমি 'কল্লোলে'র অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ ধরনের আর একটি সাহিত্যিক মাসিকপত্র এখনও আমাদের দেশে হ'লো না—মাঝখানে 'স্বদেশ' ও তার পরে 'পূর্বাশা' উঠেছিল, দুটির একটিও চললো না। 'উত্তরা' এককালে জাত-লিখিয়ের লোভনীয় পত্রিকা ছিলো, এখন থেকেও নেই। আমাদের মতো লেখকরা, যারা দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা নেহাৎই গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্টরকম গতানুগতিক ভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন মনে করতে পারি এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই।

'কল্লোল' উঠে যাবার পরে দীনেশরঞ্জন কলকাতা ত্যাগ করলেন, কয়েক বছর পরে ফিরে এসে পুরোপুরি লাগলেন সিনেমার কাজে। এতগুলি বছরের মধ্যে, একই মহানগরীতে বাস ক'রে, তাঁর সঙ্গে আমার একবার চাক্ষুষ দেখা পর্যন্ত হয়নি। এ নিয়ে মনে ক্ষোভ থেকে যেতো, যদি না গত বছর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের একটি সভায় ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতো। এক যুগ পরে দেখা, আর 'কল্লোল'-যুগের পরে এই প্রথম! তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে শেষ দেখাও হবে এই।

দীনেশরঞ্জন মানুষটি ভারি মনোহর ছিলেন। সুপুরুষ, আলাপ-ব্যবহার সুন্দর, নানা গুণে গুণী। তিনি লিখতেন, কিন্তু মুখ্যত লেখক ছিলেন না ব'লেই বোধ হয় সম্পাদক হিসেবে এত বেশি যোগ্য ছিলেন। তাঁর আঁকা D. R. স্বাক্ষরিত ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি এখনো হয়তো অনেকের মনে আছে। তাছাড়া গানে ও অভিনয়েও তাঁর দখল ছিলো। তাঁর কথা মনে হ'লে এখনো আমার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন প্রথম কম্পিতবক্ষে 'কল্লোল' আপিশে ঢুকেছিলাম। ১০।২ পটুয়াটোলা লেনের সেই বিখ্যাত আড্ডাগুলি কখনো কি ভুলবো! সে-আড্ডায় সকলেই আসতেন—নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল, হেমেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্রলাল, মণীশ ঘটক ('যুবনাশ্ব'), ধূর্জটিপ্রসাদ, কালিদাস নাগ, নলিনী সরকার (গায়ক), জসীম উদ্‌দিন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,

ভূপতি চৌধুরী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও আরো অনেকে। এমন উদার ও বিচিত্র আড্ডার স্বাদ আমার জীবনে সেই প্রথম। মাঝখানে কিছুদিন দীনেশরঞ্জন সাপ্তাহিক 'বিজলী'রও সম্পাদক ছিলেন, গ্রীষ্মের তীব্রতপ্ত দুপুরে বৌবাজারের সেই তেতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি আড্ডার লোভে-লোভে। উপরে যাঁদের নাম করলুম তাঁরা প্রায় সকলেই অবশ্য 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং বেশির ভাগেরই খ্যাতির প্রথম সোপানও 'কল্লোল'। তাছাড়া আমাদের আড্ডায় যাঁদের কখনো দেখিনি, কিংবা কমই দেখেছি, এমন অনেকের লেখাও প্রথম 'কল্লোলে' বেরোয়. এবং 'কল্লোলে'র সূত্রেই তাঁদের নাম বাইরে ছড়ায়—যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়. জগদীশ গুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ। প্রবীণদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বাগচী, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নরেন্দ্র দেবের রচনা 'কল্লোলে' প্রায়ই বেরুতো—রাধারানী দেবীও নিয়মিত লিখতেন—এবং এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে তৎকালীন তরুণ লেখকসমাজে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলালের প্রতিপত্তির জন্য 'কল্লোল'ই প্রধানত দায়ী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনুকম্পা থেকেও 'কল্লোল' বঞ্চিত হয়নি, তাঁর অন্য নানা রচনার মধ্যে 'বাঁশি যখন থামবে ঘরে' কবিতাটি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়। সে-সময়ে যামিনী রায় এতখানি মর্যাদা লাভ করেননি. কিন্তু তাঁর ছবি 'কল্লোলে' দেখেছি ব'লে মনে পড়ে। এ-কথা এখানকার অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে নজরুলের গজল গানগুলি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়, আর 'কল্লোল' আপিশের তক্তাপোষে ব'সে নজরুল যখন ও-সব গান গেয়েছেন তখনও তা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। বস্তুত. বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে-ক'টি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো 'কল্লোল', এবং সে-হিসেবে 'সবুজপত্র' ও 'ভারতী'র সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোলে'র নামও রইলো।

রবীন্দ্র-পুরস্কার

সম্প্রতি পঁচিশজন বাঙালি সাহিত্যিক ও শিল্পী স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে কবি-হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর নামে বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করা। সাহিত্য বলতে তাঁরা যে শুধু কল্পনাপ্রবণ রচনাই বোঝেন সে-কথাও তাঁরা

ব'লে নিয়েছেন, এবং ব'লে নিয়ে ভালোই করেছেন, কারণ যে-ধরনের রচনার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি কিংবা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেয়া হয় তা যে সাহিত্য নয় আমাদের দেশে অনেকেরই সে-ধারণা নেই। বাঙালি লেখকের দারিদ্র্য-দুর্দশার উল্লেখও ইস্তাহারে আছে; কথাটা খুব বেশি জানাজানি হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে বলা ভালো, দারিদ্র্যেই প্রতিভা ফোটে এ-কুসংস্কার অন্তত যদি এতে কেটে যায় সেটুকুই হবে লাভ। এ তো স্পষ্টই দেখা যায় যে প্রাচীন সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার কাজে কিংবা যে-সব কেরানিকর্ম এ-দেশে 'স্কলারশিপ' নামে চলে তাতে বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে উৎসাহদাতার অভাব নেই, অথচ নবীন সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে চারদিকেই কঠোর উদাসীনতা। যাকে ভুলে গেলে কোনোই ক্ষতি ছিলো না, মধ্যযুগের এমন-কোনো নগণ্য কবির কোনো তুচ্ছ রচনার পুনরুদ্ধার মস্ত কৃতিত্বের কথা, তার পুরস্কারও হাতে-হাতে মেলে, কিন্তু সাহিত্যের স্রোত যাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখছেন, যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা হয়তো মৃত্যুর নিরাপদ ক্ষেত্রে পৌঁছবার পরে গবেষণার বিষয় হ'তে পারেন, কিন্তু জীবিতকালে কোনোদিক থেকেই কোনো উৎসাহ কি সম্মান তাঁদের ভোগ্য হয় না। বিশেষত বাংলাদেশে, যেখানে বইয়ের বিক্রি বলতে গেলে নেই-ই, এবং সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না-হ'লে বিক্রি বাড়বার আশাও নেই, সেখানে সৃজনী সাহিত্যের জন্য পুরস্কার অনেক আগেই প্রবর্তিত হওয়া উচিত ছিলো, একটি নয়, অনেকগুলি। তা যে হয়নি, একটিও যে হয়নি, তাও সাহিত্যবিষয়ে বাঙালি সমাজের একান্ত উদাসীনতারই প্রমাণ। বাঙালিদের মধ্যে ধনী আছেন, দাতাও আছেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত সাহিত্যের কথা কারো মনে হ'লো না, এমন-কোনো বৃত্তিস্থাপন করা হ'লো না যা পুরুষানুক্রমে লেখকদের কাজে লাগতে পারে। আমেরিকায়, ফ্রান্সে ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে, যেখানে বইয়ের কাটতি প্রচুর ও লেখকরা স্বাধীন ও আত্মসম্মানী জীবনযাপনে সক্ষম, সেখানেও এ-ধরণের বহু পুরস্কার আছে এবং সে-সব পুরস্কারেরই কোনো-না-কোনোটি লাভ ক'রে অনেক তরুণ লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এ-সবই আমরা জানি, তারিফও করি, কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা এতই অল্প যে স্বদেশের জন্য সামান্য চেষ্টাতেও আমরা বিমুখ, যদিও বিদেশের বাহবায় সর্বদাই উচ্ছ্বসিত। এতদিনে এ-বিষয়ে যখন একটা কথা উঠেছে, তখন এ যাতে কয়েকদিনের বাকবিতণ্ডায় নিঃশেষ না-হ'য়ে বাস্তবে রূপ নিতে পারে সে-বিষয়ে তাঁদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত, সাহিত্যে যাঁরা উৎসাহী। বিশেষত, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যখন আছেন তখন এমন

আশা করা অন্যায় হয় না যে প্রস্তাবটি হাওয়ায় ভেসে যাবে না। এক বছর পর-পর এক হাজার টাকার পুরস্কার দিতে খুব বেশি মূলধন লাগে না, বাংলাদেশে এমন ধনীও আছেন যিনি একাই সমস্ত টাকাটা দিয়ে দিলে কিছুই টের পাবেন না। মূলধন সংগৃহীত হ'লে সেটা বিশ্বভারতীর হাতে অর্পণ করা যেতে পারে, কারণ এই 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' বিশ্বভারতী থেকে প্রদত্ত হ'লেই সব চেয়ে শোভন হয়।

বুদ্ধদেব বসু

অমিয় চক্রবর্তী

জয়েস্ প্রাসঙ্গিক

প্যারিস। কুয়াষাচ্ছন্ন অপরাহ্ন, রাস্তায় আলো জ্বলচে। য়ুরোপ ছাড়বার সময় হয়ে এল। সীরিয়া হয়ে দেশে ফেরবার উদ্যোগ করচি, বেশির ভাগ দিনটা তাই কাটল বিভিন্ন টুরিস্ট আপিসে। হঠাৎ মনে হল যাই জয়েস্-এর কাছে; শেষ ফরাসী সন্ধ্যাটা ভ'রে তুলি। সেদিন দেখা হয়েছিল এক সম্মেলন, আসতে বলেছিলেন।

জেম্স্ জয়েস্-এর লেখা কখনো ঠিকমতো পড়িনি, এখনো আমার অসাধ্য। শব্দসমুদ্রে এক ডুব দিয়ে চলে আসি, তাও নানারকম শ্যাওলা এবং অদ্ভুত জীব গায়ে লেগে থাকে। অস্বস্তি বোধ হয়। অভিজ্ঞতার গভীরতাও চোখে মনে ঝলকে দেয়, ভোলা যায় না। কত রং, কত গতি, জলের নীচে ভাঙাচোরা টলমল দৃশ্য। নোনা জলে চোখ জ্বালা না করলে আরো দেখা যেত—এই বাক্-সমুদ্রে বেশিক্ষণ থাক্‌তে ডুবুরির বিশেষ কৌশল-সরঞ্জাম চাই। অথচ এও জানি যে আমাদের ভাষা, চিন্তাধারার ভঙ্গী কোন্ দূর সূত্রে ঐ উত্তাল ক্ষ্যাপা জিনীয়সের সঙ্গে বাঁধা পড়েচে। অর্থাৎ আজ আমরা যা, তার খানিক অংশ এই প্যারিসীয় আইরিশ লেখকের যদৃচ্ছ রচনার ফল। দশ হাজার মাইল পারের আগন্তুক বাঙালির মনে এই আত্মীয়তার রহস্য আশ্চর্য্য ঠেকছিল।

উঠলাম সিঁড়ি বেয়ে। জয়েস্-এর ঘন পর্দা দেওয়া ফ্ল্যাটের দরজায় লেখক স্বয়ং

* জেম্‌স জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)। প্রধান গ্রন্থ: (ছোটো গল্প: Dubliners; উপন্যাস. A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses, Work in Progress (ছোটো-ছোটো অংশে প্রকাশিত); কবিতা: Chamber Music.

দাঁড়িয়ে। খুব একটা পুরু কার্পেট ; প্রশস্ত, সজ্জিত, অথচ পুরোনো ভাব ঘরটায়। বহু আলো জ্বালা। জয়েস্-এর চোখে অত্যন্ত মোটা চশমা, অস্বচ্ছ দৃষ্টির কাঁচে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়। আবার মনে পড়ল সামুদ্রিক জগতের কথা। ইনি ঠিক শক্ত ভাঙাব লোক নন।

উঠল ভারতীয় প্রসঙ্গ ; সেখানে লেখকরা কী করচে ? খুব সশ্রদ্ধভাবে রবীন্দ্র-নাথের নাম করলেন। বললেন তর্জ্জমা পড়তে নেই, তর্জ্জমা সাহিত্য নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, এই বাঙালি প্রতিভাকে তবু চেনা যায়। তাঁকে দেখেওচেন প্যারিসে। বাংলাভাষায় কি বহুদেশের শব্দ মিশেচে ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ? ভাষা সম্বন্ধেই সব চেয়ে কৌতূহল দেখলাম।

নিজের কথা বিশেষ বলতে চান না। কিন্তু **Work in Progress** সম্বন্ধে কিছু ইসারা পাওয়া গেল। একদিন জয়েস্ এক বন্ধুকে (মনে পড়চে না **Ogden** না **Richards**) নূতন লেখার অংশ পড়ে শোনাচ্চেন। ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে ; টেবিলটার ধারে দুজনে তখনো ব'সে। হঠাৎ কী একটা কথা মিলিয়ে দেখবার জন্যে জয়েস্-কে অন্য কামরায় যেতে হবে, দরজা খুলে অন্ধকারে একেবাবে দাসীর গায়ে গিয়ে পড়লেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দরজায় কান দিয়ে সে শুনছিল। ফরাসী দাসী, তা ছাড়া অশিক্ষিতা বল্লেই চলে—রচনার এক বর্ণও তার বোঝা অসাধ্য। (ইংরেজ এবং শিক্ষিতা হলেও বুঝত না।) বল্লেন, দেখ, যারা বোঝবার তাবা বোঝে। কেন কে বোঝে তার উত্তর নেই। যাবা শোনে বা পড়ে, শোনবাব এবং পড়বার জন্যেই, তাদের বুঝতে বাধে না। কারণ, বোঝাটা উপলক্ষ্য। পণ্ডিতেবাও সাহিত্যে কখনো প্রবেশ করে না তা নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কম্প্লিমেণ্ট পেয়েছি মূঢ় দাসীর কাছে।

শুনে গেলাম। মার্কিন-ঘেঁষা উচ্চাবণ, খানিক ব'লে অনেকখন থেমে যান, আবার কথাটা শেষ করেন। ফুটকি দেওয়া, আলগা কথার প্যারাগ্রাফ। কিন্তু চিত্তহারী। দুচার মিনিট চুপ কবে বললেন, গ্রামোফোনের রেকর্ডে আমার কণ্ঠের গদ্য পাঠ আছে। অনেকে শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। এর নানারকম কারণ রয়েচে। রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গেও আচ্ছন্নতাব যোগ হয়তো আছে। কিন্তু গান শুনে এম্নি হয়। সেটা মানের জন্যে নয়।

তাঁর স্ত্রী এলেন। চা খেতে হবে। পুরোনো রূপোর চা-সামগ্রী নিয়ে যে ঢুকল, সাজিয়ে দিল, এই কি সেই শ্রেষ্ঠ সমঝদার প্রাচীনা গৃহসেবিকা ? প্রশ্নটা মনেই রয়ে গেল। চায়ের সময় জয়েস্-এর মুখ গম্ভীর, কথা গম্ভীর। প্লেট, চামচ, আহার্য্য,

কে খাচ্চে, কেন খাচ্চি এই সব নিয়ে যেন অত্যন্ত কী একটা ভাবচেন। চায়ের জিনিষগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মধ্যে প্রশ্ন ক'রে নিলেন কবে যাব, ঠিক কোন্ সময়ে, ঠিক কোন্ ট্রেনে। মনে হচ্ছিল গভীর কোন্ রহস্যের সন্ধান দিচ্চি।

আরেকটা কথা মনে আছে। ছোটো ছাপানো পুঁথি দেবেন আমাকে, নতুন গ্রন্থের টুকরো। বললেন, জাহাজে উঠে যেন পড়ি। এবং জাহাজ থেকেই সঠিক জানাই কীরকম লাগল। বইয়ের বক্তব্য এবং ভাষা সম্বন্ধে বললেন, শোনো। যে কোনো য়ুরোপীয় বন্দরে মদের আড্ডায় দু-দশ দেশের নাবিক জোটে, তারা কেউ নেমেচে দুঘণ্টার, কেউ দুদিনের জন্য। এসেচে সন্ধ্যায় একটু মিল্‌তে-মিশ্‌তে। কী তাদের বক্তব্য, কী তাদের ভাষা? কেউ নরোয়েজিয়ান্, কেউ লেভান্‌টাইন জ্যু, ডচ্, স্প্যানিয়ার্ড কি মার্কিন বা ইংরেজ। ভাষার কোনো রাস্তা নেই অথচ বেশ কথাবার্ত্তা চলে। হাতে বোতল, চোখে হাসি, মুখে কথার ফোয়ারা, কেউ দীর্ঘ গল্প বল্‌চে অন্যে দরদ দিয়ে শুনচে, যা বুঝচে তাই যথেষ্ট। কেউই প্রমত্ত বা বিরক্ত, এমন অবস্থার কথা হচ্চে না। দেখ, কেমন জমে।

বল্‌লেন তাঁর বইয়ে অনেক বাক্যই নানা ভাষার টুকরোয় বা আবহাওয়ায় রচিত। কখনো দুয়ে তিনে মিলে স্বতন্ত্র এক হয়েচে, কখনো বা কথার ভগ্নাংশ ধ্বনিতে বিধৃত। কখনো সমস্ত পদটাই পাঁচদশটা ভাষা বা জাতীয় ভঙ্গীর সৃষ্টি। ভাষা বা বক্তব্যের মূলে যারা যাবে তারা মনের কথা, শরীরের কথা সব মিলিয়ে মানুষের কথা শুন্‌বে। লেখাও সেইজন্যে।

শুনে মনে হচ্ছিল যাঁরা নিজেদের রচনায় আইডিয়া বা বিষয় কিছু আছে স্বীকার করতে নারাজ তাঁরাই বক্তব্য সম্বন্ধে আরো সচেতন। ভাষার নীহারিকা জয়েস্-এর সচেষ্ট মননজাত সৃষ্টি। ভাবও অনেকাংশে থিয়োরির অনুশাসনে গাঁথা। মগ্ন মনের ঢেউ মেশাবার কৌশলে আত্মবিস্মৃতির দীর্ঘ অভ্যাস দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সব মিলে যে অদ্ভুত প্রবর্ত্তনা সেইটেকেই প্রধান ব'লে মানব।

টুকরো পুঁথিটা জাহাজে পড়েছিলাম। স্বীকার করব ব্যাপার সহজ হয়নি। কেননা প্রায় কিছুই ধরতে পারিনি। বোঝবার চেষ্টা করলে মাথা ফাটবার অবস্থা, না করলে কালো অক্ষরের স্রোতে ভাসতে হয়। কখনো গূঢ় বর্ণোজ্জ্বলতার আভাস পাই। হাওয়ায় হারানো কোন চেনা কথা কানের পাশ দিয়ে হারিয়ে যায়। মনে খুব একটা স্পন্দন অনুভব করি। তার পর বিশ্রী একটা কথা এসে ধাক্কা দেয়। যেন অশুচিতার ভয় দেখানো। শেষ পর্য্যন্ত কথার স্তূপে, কথার অঙ্ক শাস্ত্রে, ভাবের ল্যাবরেটরির গন্ধে বিরক্ত হয়ে বই ফেলে দিয়েছিলাম। সরকারী পোষাক-আঁটা জাহাজী ইংরেজের

কথাও তখন শুনতে ভালো লাগছিল : মেডিটেরেনিয়নেব নীল অর্থহীন শব্দ ঢের বেশি বুঝি। অথচ বইটার সুদূব সান্নিধ্য মনে অনুভব করলাম ; পড়াটার দরকার ছিল। Finnegans Wake-গ্রন্থে ঐ অংশ আবার পড়েছি। ঠিক একই অভিজ্ঞতা।

জয়েস্‌কে কিছু লিখতে পারলাম না। কেননা অমনতব গ্রথিত একনিষ্ঠ রচয়িতাকে বাহিবেব কথা শোনানো বৃথা।

জয়েস্-এব চেহাবা মনে পড়ে। শুষ্ক সকৌতুক ভাব ঠোঁটের কোণায়, মুখে নিগূঢ় ঔদাসীন্য—খানিকটা বোধ হয় চোখেব জন্যে—অথচ হৃদ্যতার অভাব নেই। সৌজন্য অশেষ।

এইখানে মজাব কথাটা বলি।

চলে আসবাব ঠিক আগে জয়েস বললেন, তোমাকে একটা পুবোনো বই দেব, তোমাব নামের অর্থ একটু স্পষ্ট বুঝে নিই। পাশেব ঘবে চলে গেলেন।

যে-বইখানি এনে দিলেন তাতে লেখা To Mr. Ambrose Wheelturner। বললেন, য়ুরোপে তোমাব এই নাম ঠিক হবে। শুধু তর্জ্জমা নাম নয়, এটা সত্যি নাম। (অংশ)

আধুনিক বাংলা কবিতা

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের সংকলিত আধুনিক বাংলা কবিতা পাওয়া গেল। ভয় ছিল যা কিছু বিকলাঙ্গ বিকৃত যা কিছু প্রকৃতিব আবর্জনা সেইগুলিকে ঝেঁটিয়ে একত্র করে তার উপরে বাঁকা দুর্বোধ্য লেখার ছাপ দিয়ে দুর্ভাগ্য সাধারণেব সামনে উপস্থিত করবে, ভুলিয়ে নিয়ে যাবে তাকে মানবেব চিবন্তন রুচি ও রীতিব রাজপথ থেকে। আমাব ক্ষীণ দৃষ্টি ও ভাঙা শরীবে এই জটিল দুর্গমে প্রবেশ কবতে ভয় পাই। কিন্তু তোমাদের এই সংকলন দেখে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছি। প্রায় সবগুলিই বিশেষভাবে উপভোগ্য। এই সর্বকালীন কবিতাগুলিকে কেন তোমবা আধুনিকেব কোঠায় ফেলেছ তার একটা ব্যাখ্যার দরকাব। সম্ভবত ভূমিকায় তাব আলোচনা আছে। ভাঙা দৃষ্টি যেন ভাঙা লাঙল, লাইনগুলোকে জোবে ঠেলা দিয়ে দিয়ে চাষ চালাতে হয়। কোনো একটা অবকাশে ভূমিকা পড়ে দেখব। আমাব শ্রুতিশক্তিও তার একটা পাল্লা বন্ধ করেছে, তাই আর কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়াও আমার পক্ষে সহজ নয়।

সংকলনকর্তার কাছে আমার একটা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবার আছে। দীর্ঘ-কাল হোলো শিশুতীর্থ বলে একটি গদ্য ছন্দের রচনা বানিয়েছিলেম। আজ পর্যন্ত সেটা কারো যে চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাইনি। তোমরা যে সেই কক্ষ-চ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছ এতে খুশি হয়েছি।

একটা ঘটনার উল্লেখ করে চিঠিখানা শেষ করি। সার মরিস গোইয়ার ইতিমধ্যে যখন এখানে এসেছিলেন আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেম তাঁদের আধুনিক কবিতা অতি বিশেষ ভঙ্গিমার বেড়া দেওয়া সাহিত্য, সে কেবল বিশেষ দলের জন্য রিজার্ভ করা। তিনি হেসে বললেন সর্বজনীনতার দিন সাহিত্যে আবার ফিরবে।

এর কিছু কিছু লক্ষণ এখনি সেখানকার জনমতের মধ্যে দেখা দিচ্চে। তাহলে সেই হাওয়া বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করবে এই আশা মনে পোষণ করি।

আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানি সর্বসাধারণের সমাদরের যোগ্য এই আমার অভিমত। ইতি ২০।৮।৪০

রবীন্দ্রনাথ

সমালোচনা

গল্প-সংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী

শুনেছি নাকি পৃথিবীর কোন জিনিষেরই একটা নিবদ্ধ রূপ নেই, দৃষ্টির ভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে সবই কলেবর ধারণ করে। তাই যদি হয় তবে আমরা প্রমথ বাবুর জগৎ সংসার দেখ্‌বার দেব-দুর্লভ চশ্‌মাখানা চাই। কারণ তিনি চোখে দেখাটাকে এক অপরূপ চারু-শিল্পে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর গল্প-সংগ্রহখানা পড়ে বারংবার মনে হয়েছে যে এ কথা সত্য নয় যে তাঁর কাহিনীর মন-গড়া রাজ্যে আমাদের এই প্রতি-দিনকার অভিজ্ঞতার ধুলোমাখা পা জোড়াটাকে রাখবার স্থানাভাব হবে। বরং তাঁর অপরূপ কল্পনার বিস্ময়ই হচ্ছে যে আমাদের স্থূল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাম্নেও সে নিরাকার হ'য়ে যায় না।

এটাই হ'ল সব থেকে আশ্চর্য্য যে এমন লেখনী, যা'র বিষয়ে ব'লে আর শেষ করা যায় না, সেই সবুজপত্রের যুগ থেকে আজ অবধি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এবং

* আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা" নামক সংকলনগ্রন্থ সম্বন্ধে কবির এই পত্র বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত করা হোলো। পত্রখানি বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত।

আরও দু একটা ভূমিকা ও মুখপত্র জাতীয় পরিচিতি ছাড়া তার সম্বন্ধে পূর্ণাবয়ব প্রবন্ধ বিশেষ কিছু লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ আমাদের এই বস্তু-গর্ব্ব-করা নৈর্ব্যক্তিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলিজম্‌-এর এমন চূড়ামণি আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই সত্তর বছরের গুণীর চেয়ে আধুনিক আর কেবা আছে। ছোটগল্প লেখা সহজ নয়, তার জন্য এমন দৃষ্টিনৈপুণ্য চাই যা সহসা সূর্য্যকরাঘাতের মতন ছোট ছায়ামগ্ন পুষ্করিণীকে উদ্ভাসিত করে দেয়। প্রমথবাবুর আছে সেই দৃষ্টি। বিলেত সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেই গল্প লিখেছেন। প্রমথবাবুও লিখেছেন। কিন্তু তার গুলি পড়ে একবারও মনে হয় না যে বিলেত এবং বিলেতফেরত বাঙালীদের মধ্যে এমন একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র আছে যা আমাদের মতন বঞ্চিত ও হতভাগ্য পাঠকদের বোধের বাইরে। তাঁর গল্পগুলি নিতান্তই একজন বিলেত-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের বিষয়ে, যার অভিজ্ঞতাগুলি অভাবনীয় হলেও অসম্ভব নয়। আর যার অপূর্ব্ব অ্যাডভেঞ্চারগুলি রাত্রিশেষের স্বপ্নের মতন দুষ্প্রাপ্য এবং মধুময়। **Blase** না হয়েও যে আধুনিক হওয়া যায় তার আর অন্য কোনও নিদর্শনের প্রয়োজন নেই।

তবে প্রমথবাবুর এই সহজ ভাবের অন্তরালে আছে বহু সাধনা। ঐ যে অপরূপ চশমাখানা, যাকে আমরা সকলেই ঈর্ষান্বিত নেত্রে দেখি, ওটি নিয়ে উনি জন্মেছিলেন কিনা সন্দেহ। বহু শিক্ষা বহু চিন্তা বহু অভিজ্ঞতার পর এবং পৃথিবীর সাহিত্য সমুদ্র আমন্থন করে তবে ওটি লাভ করেছেন ব'লে সন্দেহ হয়। কারণ তাঁরাই কেবল আত্মকে হারিয়ে পৃথিবীর দর্শক হন, যাঁদের শুধু চোখ নেই, সেই চোখ দিয়ে দেখবার মন্ত্র জানা আছে, যারা তাঁদের আবেষ্টনী থেকে রূপ নেন না কিন্তু যাঁদের মন থেকে আবেষ্টনীতে রং ধরে যায়। "চার-ইয়ারী-কথা" থেকে একটু উদ্ধৃত করে দিই "যে দেশ ইউরোপ যে দেশ তুমি আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়—কিন্তু সেই কবি-কল্পিত রাজ্য যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম। ..আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি আকাশ জুড়ে হাজার হাজার জাসমিন হথর্ন প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছে, ঝরে পড়ছে, চারিদিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। সব অভিজ্ঞতার মধ্যে এই শুভ্র আকাশ কুসুমের মৃদু সুগন্ধ তাতে ঘরোয়া ব্যাপারও রোমাঞ্চকর হয়ে গেছে, সাধারণ ঘটনাতেও অভাবনীয়ের ইঙ্গিত লেগে রয়েছে।

প্রমথবাবুর গল্পগুলি পড়ে মনে হয় যে এ সকল ঘটনা আমাদের জীবনে হতে পারত, কিন্তু এত আশ্চর্য্য কাহিনী যে আমাদের জীবনে তা' কখনও হবে না। এমন কি উপস্থিতবুদ্ধি ঘোষালের ও মিথ্যাপরায়ণ নীল-লোহিতের জীবনেও এমন

কোন ঘটনা ঘটে নি যা' আমাদেরও জীবনেও ঘটতে পারতো না, যদি আমরা তেমন সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাতাম ! এ সমস্ত কাহিনী প্রাণ থেকে নৈরাশ্যের মেঘকে কাটিয়ে দেয়, শুধু বেঁচে থাকাটাকে অপূর্ব্ব সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ক'রে দেয়। ছদ্মবেশী নীল-লোহিতের সয়ম্বর-সভায় উপস্থিতি, এবং মিস্ বিশ্বাসের পশ্চাতে সালঙ্কারা সুন্দরীদ্বারা মাল্যদান, সুন্দরীর পিতার রোষ, নীল-লোহিতের আত্মপরিচয়, মিথ্যা-বাক্য ও প্রত্যাখ্যান—এ সমস্তই এমন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত যে আমাদেরই বা অমন না হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এমন অপরূপ যে পথেঘাটে অমন ঘটনা মেলে না, তাই আমাদের জীবনে কখনও ঘটবে না। এই সম্ভব অসম্ভবের সমাবেশটি আমাদের মনোহরণ করে।

প্রমথবাবুর গল্পের কেবল এই অপরূপ দিকটা দেখতে গেলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। কারণ যদিও আমার মনে হয় এই মাটিতে প্রতিষ্ঠান করা আদর্শবাদটাই বিশেষ ক'রে তাঁর গল্পগুলিকে আর সকলের গল্প থেকে পৃথক করে দিয়েছে, তবু তাঁর গল্পসংগ্রহখানা পড়লে তাঁর কল্পনার বিস্তৃতি ও কাহিনীর বৈচিত্র্য দেখলে বাক্যহত হ'তে হয়। "নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলার" রাষ্ট্রনীতি, "বড়বাবুর বড়-দিনের" হতাশ-প্রেম, "ঝাঁপান খেলার" অপূর্ব্ব চিত্র, "বীণাবাই"-এর জীবন কাহিনী, "জুড়ি-দৃশ্যের" ট্র্যাজেডি এবং প্রত্যেকটি অলৌকিক কাহিনীর গোপন অশ্রুপাত, কোনটির সঙ্গে কোনটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই, কিন্তু প্রত্যেকটিই প্রমথ-বাবুর আশ্চর্য্য সুরুচির দৃষ্টান্ত। ঠিক কতখানি গ্রহণ করতে হ'বে আর কোনখান থেকে নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করতে হ'বে এমন আর কে জানে। "জুড়ি-দৃশ্যের" তিন জুড়ির উত্তর-কাহিনী জানবার জন্য আমরা আগ্রহে অধীর হই, কিন্তু প্রমথবাবু আমাদের সম্পূর্ণতার অন্তিম-ভাবটা থেকে উদ্ধার করে রাখেন।

কোনখানেও একটুখানি উচ্ছ্বাস নেই ; রচনার মধ্যে হাস্যরস আছে, করুণ রস আছে, বীভৎস রসও আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল শিল্পের মূলমন্ত্র যে স্থির সংযম তা'ও আছে। হাস্যকর না হয়েও যে গল্প সম্ভ্রান্ত হ'তে পারে, স্বাভাবিক কাহিনী সরলভাষায় লেখা হ'লেও যে অক্ষরে অক্ষরে অভিজাত সভ্যতার ছাপ রাখতে পারে, এ বিষয়ে প্রমথবাবুর গল্প পড়লে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কোথায় যেন পড়েছিলুম যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পের উদ্ভাবনা হ'বে স্বতঃসিদ্ধ ; কিন্তু প্রকাশ হ'বে বহু চেষ্টা ও সাধনার ফলে ; এগুলি সে কথারও নিদর্শন। এই সংক্রান্তে দুটি গল্প পড়তে সকলকে অনুরোধ করি, "ঝাঁপান-খেলা" ও "বীণাবাই"। এমন অপূর্ব্ব কাহিনী পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় দুর্লভ। "ঝাঁপান-খেলা" ঘরোয়া গল্প, নায়ক বীরবল,

কুকুর দেখবার ভৃত্য, পরম রূপবান, কালো পাথরে খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির মতন দেখতে, পরস্ত্রীহরণপটু, চতুর, মনোহর। রাত্রে সে গোপনে ঝাঁপান খেলতে গেল। যেদিন বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিল সেইদিন এই খেলা খেলতে হয়, কিন্তু এ খেলা বে-আইনী, তাই গোপনে খেলতে হয়। সাপের বিষদাঁত না ভেঙে এই খেলা খেলতে হয়, প্রায়ই এক আধজন মারা যায়। বীর-বলের মনের মতন খেলা। কিন্তু ঐ সাপের কামড়েই বীরবল মরলো। নৈপুণ্যের অভাবে নয়, আরেকজনকে বাঁচাতে গিয়ে। সকালবেলা তা'র আদরের মুনিবপুত্র গিয়ে দেখল তা'র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে, তার দেহ নীলবর্ণ ধারণ করেছে, সে চোখ খুলে বালকের দিকে চেয়ে বল্লে—"হাম চল্‌তা, কুচ ডর নেই।" এই বলে সে মরে গেল, আর মুনিবপুত্র দেখলো "সেই দেহ, সেই রূপ, সবই রয়েছে, চলে গিয়েছে শুধু বীরবল।" এমন অপূর্ব্ব চ'লে যাওয়া কে কল্পনা করতে পারতো।

আর বীণাবাই-এর উপাখ্যানও সেই প্রাচীন গৃহত্যাগিনী কন্যার উপাখ্যান, কিন্তু এইরকম অপূর্ব্ব তেজস্বিনী গৃহত্যাগিনী তো আর কোথাও দেখি নি; আর অবশেষে বীণাবাইও অন্তর্হিতা হলেন, এবং নায়কও সেই অবধি জীবন নামক নৌকা ঝাঁঝাবতে ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

আমাদের চিরক্ষুধাতুর মনটা এই সসাগরা ধরণীটাকে নিয়েও তৃপ্ত হয় না, নিয়ত নব নব রাজ্য কামনা ক'রে থাকে, তাই অলৌকিক-এর স্থান হয়েছে সাহিত্যে। কিন্তু আজকাল আমরা ভূতের গল্প শুনে ভয়ে সম্বিৎ হারাতে চাই না, অলৌকিকের অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখে রোমাঞ্চিত হ'তে চাই; যে বিষয়ে কেহই কিছু জানে না, তার স্বরূপের শিহরণ চাই। কবন্ধ পিশাচ দেখতে চাই না, তাই প্রমথবাবু দেখিয়েছেন গভীর নিশীথে, নির্জ্জন পান্থশালায় শঙ্খপরিহিতা কষ্টিপাথরে তৈরী সুন্দরী। আর দেখিয়েছেন রক্তবস্ত্রপরিহিত, চন্দনঅঙ্কিতভালে, ছোট শিশু নদীর বক্ষে তামার ঘড়ার উপর উপবিষ্ট। ইংরিজিতে একটা কথা আছে "charm", যার ভালো বাংলা হয় না, আর বাংলায় একটা কথা আছে "রস", যার ভালো ইংরিজি হয় না। প্রমথবাবুর গল্পের মধ্যে এই দুইটি আছে, আর এরা সাধারণকে অসাধারণ করে দিয়েছে, স্বাভাবিক ঘটনার আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

প্রমথবাবুর গল্পসংগ্রহের কাহিনীগুলির এত বৈচিত্র্য যে তার থেকে যদি কোন একটি moral বের করতে হয়, সে হচ্ছে যে বেঁচে থাকা একটি চারুশিল্প। জগতে যে জিনিষকে আমরা মনে মনে যা মূল্য দিই, আমাদের কাছে তৎক্ষণাৎ সেইটাই তা'র প্রকৃত মূল্য হয়ে যায়। উপভোগ করবার মন্ত্র না জানা থাকলে, নির্জ্জন

কক্ষের বর্ষাসন্ধ্যা, আর খররৌদ্রে জনহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে পাল্কী যাত্রা, রেল-গাড়ীর আশ্চর্য্য সহযাত্রীরা আর হঠাৎ-দেখা-পাওয়া সুবাট-সুন্দরীর সঙ্গ সমস্তই অর্থহীন হয়ে যায়। ঠিক এই সময়ে এবং আমাদেব বাংলাদেশে, এই শিক্ষাটির প্রয়োজনও ছিলো। আরও শেখবার প্রয়োজন ছিলো প্রমথবাবুব সব কথার পিছনে একটা মৃদু হাস্য গোপন রাখবার উপায়টি। তাঁব চলিত অথচ সুমার্জিত বাংলার প্রশংসা অনেকেই করেছেন, কিন্তু তাঁব কোমল উপহাসটুকু অনেকের নজব এড়িয়ে গেছে। মানুষের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, তাকে একটু লজ্জা দিয়ে, একটু হাসিয়ে এমন অপ্রস্তুত করতে ডিকেন্স ছাড়া আব কেউ পেরেছেন বলে মনে পড়ছে না।

আর ভালো লেগেছে আমাদের গল্পের মধ্যে অমন সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, সহজ, সরস, সুচতুর কথোপকথনগুলি, যেন প্রমথবাবু অনেকগু'ল ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে রসিকতা করছেন। কারণ বর্ত্তমান জীবনেব বৃহত্তম ট্রাজেডি হচ্ছে, যদি বা বস-সৃষ্টি করবার লোক মিললো, রস নিবেদন কববাব পাত্র মেলা দায়। আব প্রমথবাবু গল্পের পর গল্পে একটি নয়, একজোড়া নয়, চাবটি পাঁচটি ক'বে এক সঙ্গে এ হেন বস্তু উপস্থিত কবেছেন।

প্রমথবাবুব বর্ণনা করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ "চাব ইয়াবী কথাব" সোমনাথেব কথা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত কবি। প্রেমেব কাহিনীব কেমন সবস সুন্দব অবতাবণা হচ্ছে—"একবার লণ্ডনে আমি মাস খানেক ধরে অনিদ্রায় ভুগছিলুম। ডাক্তাব পরামর্শ দিলেন Ilfracombe যেতে। শুনলুম ইংলণ্ডেব পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়া লোকেব চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দেয়, চুলেব ভিতব বিলি কেটে দেয়; সে হাওয়াব স্পর্শে জেগে থাকাই কঠিন—ঘুমিয়ে পড়া সহজ। আমি সেই দিনই Ilfracombe যাত্রা কবলুম। এই যাত্রাই আমাকে জীবনেব একটি অজানা দেশে পৌঁছে দিলে।"

তারপব সুন্দরীর কথা বলতে বলছেন—"আমি নিরীক্ষণ কবে দেখলুম যে, সে চোখ দুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া। লউসনিয়া কি পদার্থ জান? এরকম রত্ন—ইংরেজীতে যাকে বলে Cats-eye, তার উপব আলোব স্রোত পড়ে, আর প্রতিমুহূর্ত্তে তার রং বদলে যায়। আমি একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিলুম, ভয় হল সে আলো পাছে সত্যি-সত্যিই আমার চোখের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর প্রবেশ করে।"

এমন পরিপূর্ণ রসের ভাণ্ড আমাদের উত্তরাধিকার বলে যুগযুগ ধ'রে, যতদিন বাংলা ভাষা মানুষে পড়বে, ততদিন আমরা গর্ব্ব করব।

লীলা মজুমদার

উত্তরফাল্গুনী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিচয় প্রেস।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বোধ হয় মহৎ কবিতা রচনার অন্তরায়। এ মহত্ত্বের অনেকগুলি বিশেষত্বের মধ্যে একটির অভাব সহজেই আজকালকার লেখায় চোখে পড়ে। আগেকার কবিদের সঙ্গে অধিকাংশের একটা অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। সে যোগসূত্র নানা কারণে এখন ছিন্ন। সমাজে দুর্দিন আগত এবং দুর্দিনে লেখকেরা গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হন। সেটা হয়ত স্বাভাবিক, এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের কাপুরুষ কিম্বা পাতিবুর্জোয়া বলে সম্বোধন করলেই শেষ কথা বলা হয় না। বিক্ষোভের যুগে narrow strictness-এর চর্চা অনেকেই করছেন, এবং চর্চাটা কিছু পরিমাণে ফলপ্রদ। তবে এ চর্চার জের টানতে থাকলে অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ নির্ঘাৎ প্রকাশ পায়। তখন লক্ষণগুলিকে স্থান, কাল পাত্রের রূপ নির্দেশক হিসেবে নেওয়াই ভালো। না হলে তার মূল্য বিচারের শেষ সামাজিক মাপকাঠি হয়ত তারা। কিন্তু সে মাপকাঠি প্রয়োগ করবার সময় নির্ণয় করা কঠিন, এর প্রয়োগ-কর্তাদের যোগ্যতাও বিচার্য। ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে decadent সাহিত্য অনেক সময় ভবিষ্যৎ রচনার পথ নির্দেশক হয়েছে। এ ঘটনার উল্লেখ করে আমরা বলতে পারি যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ বর্তমান, কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভা অনস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনদর্শন আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে ইতিহাস ঋজুরেখায় চলে না, চক্রবৎ ঘোরে। সেজন্য প্রগতির কল্পনা তাঁর কাছে অর্বাচীন ঠেকে। তাঁর মতে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। অতীতের ঐতিহ্যে তাঁর আসক্তি বেশী। এ বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে কাব্য হিসেবে সার্থক করেছে, কিন্তু তার অধুনাতন রচনায় কয়েকটি বিপজ্জনক লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর বিশ্বাসের দার্শনিক মূল্য হয়ত থাকতে পারে, সেটার বিচার বর্তমান সমালোচকের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু এটা ঠিক যে বিশ্বাসকে কাব্যের পর্যায়ে আনতে গেলে দার্শনিকতা ছাড়া অন্য আরো কিছুর প্রয়োজন আছে। কাব্যে বিশ্বাসের নাটকীয় প্রকাশ আবশ্যক, ঘাত প্রতিঘাতের ভিত্তিতে নাটকীয় রূপ ধারণ করলে ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের কাব্যশক্তি প্রমাণিত হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সম্প্রতি obsession-এ পরিণত এবং বিশ্বাস যখন আবেগে পরিণত হয় তখন তার কাব্যশক্তি কমে আসে, শেষ পর্যন্ত লেখক একটি বিষণ্ণ গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন, যেখানে মহৎ সত্যের সাক্ষাৎ মেলে না, যেখানে দেখি শুধু নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনাকে পরিপাক করতে ব্যস্ত। মুদ্রাদোষ

পুনরাবৃত্তির বিষচক্রে লেখা তখন ভারাক্রান্ত হয়। অবশ্য এ কথা আগেই বলেছি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে শক্তিমান, কিন্তু দর্শন সেখানে পরোক্ষভাবে আছে। "উত্তরফাল্গুনী"র প্রথম কবিতা উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে বিশ্বাস ছিল কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু স্বরূপে বিশ্বাসী, তাই কালের গুহাচিত্রে মৃৎপ্রদীপপরম্পরা নিবাত নিষ্কম্প দীপ্তি শেষ পর্যন্ত পারে। কিন্তু—

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্ত্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
বাদুড় বানায় বাসা ; কালপেঁচা আনাচে কানাচে
ইঁদুরের ধ্যান করে ; কোণে কোণে অর্দ্ধভুক্ত শব
লুকায় হিসাবী শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
মহীলতা জোট বাঁধে ; মধ্যে মধ্যে তুষ্ট জরদ্গব
জুড়ায় অন্নের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে ব'সে।
তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
চাপা পড়ে নিরন্তর ; নোনা লেগে চূর্ণলেপ খসে
হাসে অস্থিসার শিরা। সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক
কচিত সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
পণ্যস্ত্রীর হাত ধরে, আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে
ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
দলে বৈদেহীর উরু ; ছেঁড়া পাতা, ভাঙা টিন্ ফেলে
সায়াহ্নে শহরে ফেরে। প্রদোষের নির্বেদ বাড়ায়
বিক্ষিপ্ত অঙ্গার, ভস্ম, অতিক্রান্ত উৎসবের গ্লানি।

এ বর্ণনায় একটি সভ্যতার জরা ও মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে ভাসে। শেষ কবিতা 'প্রতিপদ'-এর তুলনা আমাদের সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় একটি দুর্লভ প্রসার আছে। রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে আরব বেদুইনের রোমান্টিক মরুভূমি দেখেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

শতশ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জ্জিত সন্তপ্ত সিমুমে ;
বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত বিষাক্ত ধূসর

দুটি মরুভূমির মধ্যে একটি যুগের ব্যবধান আছে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা, কয়েকটি ছাড়া, আমার বিশেষ ভালো লাগে না, সেটা বোধ হয় আমার অক্ষমতা। এ ধরণের রচনা—

এ-ভুজ্ঞ মাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে' ;
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল নিয়ে নরকে চলে গেছে ॥

আমার অনুরাগ আকর্ষণ করে না। প্রেমের সঙ্গে দার্শনিকতার সংমিশ্রণ সহজে ঘটে না, সেটার অতি চেষ্টা একটু হাস্যকর হয়, শেলী থেকে লরেন্স তার নিদর্শন। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক কবি, তিনি তাঁর দার্শনিক ব্যর্থতাবোধের সমর্থন খুঁজেছেন প্রেমিকের ব্যর্থতাবোধে, কিন্তু তাঁর এ ধরণের অনেক রচনায় আত্ম-করুণার আভাষ আছে। অবশ্য তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে অনেক আশ্চর্য লাইন আছে। তিনি এ ধরণের রোমান্টিক বিষণ্ণতা সহজে কবিতায় আনতে পারেন।

হেমন্তের ঊর্দ্ধশ্বাস সাঁঝে
উদ্বাস্ত কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে অচিরে হারায়,

আবার তিনি স্বচ্ছন্দে বৈজ্ঞানিক রূপকের সাহায্যে লেখেন ;

তোমার সান্নিধ্যে তাই বসে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনাকে পাকে পাকে ঘিরে ;
যে দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্ম্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র জালার কক্ষে নিরুপায় করে আনাগোনা।

সুধীন্দ্রনাথের রচনায় অপরিচিত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখে অনেকে বিরক্ত হন, ভাবেন ও বলেন এটা অহেতুক পাণ্ডিত্য। এ সূত্রে মনে রাখা দরকার যে বাংলার কাব্যভাষা এতো একঘেয়ে হয়ে এসেছিল যে নতুন ভাবের ভারগ্রহণে অনেক শব্দ অক্ষম হতো। সেক্ষেত্রে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার সম্পূর্ণ কাব্যের ন্যায়সঙ্গত আর যাঁরা এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন না, তাঁরাও ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গী বদলাতে চেষ্টা করেন।

সুধীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ পরিণতির দিক কী, সেটা জানি না। কিন্তু তিনি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, এবং অতীত ঐশ্বর্য্যের অংশ নিজের কাব্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় অবশ্য "উত্তরফাল্গুনী"র চেয়ে বেশী মেলে "ক্রন্দসী"তে, তার কারণ বোধ হয় আলোচ্য কবিতাগুলির রচনাকাল "ক্রন্দসী"র পূর্ব্বে।

সময় সেন

সব-পেয়েছির দেশে, বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-ভবন, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ রোগ-ভোগের সময় যখন মাঝে মাঝে সাময়িক সুস্থ থাকতেন তেমনি এক অবসরে লেখক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁর মনে যে আনন্দ এনেছিল তার আবেগে লেখক বইখানি লিখেছেন, এবং সে-আনন্দ এ বই-এর সর্ব্বত্র ছড়ান। তার বিষয়-সন্নিবেশ, তার ভাব, তার স্টাইল 'আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি জায়ন্তে'। বইখানি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে এ আনন্দ মহাকবি ও মহালেখকের সন্দর্শনে নবীন কবি ও লেখকের আনন্দমাত্র নয়। এ আনন্দ তাঁরই নিকটে এসে মনে জমেছে যাঁর মনের মন্ত্রে লেখকের মন দিয়েছে খুব বড় সাড়া। লেখকের নিজের কথায় "'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এই তাঁর প্রথম ও শেষ মহামন্ত্র।" বরং বাস্তবতা তিনি কারও চেয়ে কম অনুভব করেন নি। এ বাস্তবতাকে তিনি যে কর্ম্মে স্বীকার করেছেন তার তুলনাও আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। কিন্তু তাঁর মন ও সৃষ্টির আনন্দ পৃথিবীর ধূলিকে ধূলিমাত্র দেখে নি, বেদের ঋষির মত 'মধুমৎ' দেখেছে।

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের দেশের নবীন লেখকেরা কি চোখে দেখতেন, তাঁদের শ্রদ্ধায় ভালবাসার পরিমাণ ছিল কত তার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় এ পুঁথিতে রয়ে গেল ভাবী-কালের লোকদের জন্য। কেবলমাত্র জীবন-চরিত এ জিনিষ কিছুতেই দিতে পারবে না। আর আমাদের মত যারা কবি নয়, সত্যিকারের লেখকও নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেছে, তাঁর মনের আলোর স্পর্শ পেয়েছে তারা নিবিড় আনন্দ ও গভীর বিষাদে এ বই পড়বে।

এ বইখানি লেখা শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে। না হলে অনেক কথা ও আলোচনা যা এ বই-এ আছে তা বাদ পড়তো। এর মধ্যে যে উচ্ছল আনন্দের প্রবাহ তা বাধা পেতো। এই বই হোতো অন্য বই।

এ বই-এর ভাষা সকলের চোখে পড়বে। আধুনিক বাংলা গদ্য যোগ্য লেখকের হাতে কত স্বচ্ছন্দগতি ও উজ্জ্বল হয়েছে এ বই তার একটি দৃষ্টান্ত।

লেখকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট মেয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে নিজেদের কিছু ঘরোয়া কথা এ বই-এ আছে। সে সব কথা এ-বই-এ স্থান দেওয়ার কড়া এবং মৃদু বিরূপ সমালোচনা দেখেছি। সমালোচকেরা লেখকের সমবয়সী, বা সে বয়সের মনোভাবকে দূর থেকে দেখার বয়স তাঁদের হয় নি। আমার মতন যারা বৃদ্ধ, লেখকের বয়সকে স্নেহের চোখে দেখতে পারে, তারা এ ঘরোয়া

কথা সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে পড়ে আনন্দ পাবে। ভাবী-কাল এই বৃদ্ধদের দিকেই। কালের ব্যবধান বয়সের প্রভেদের কাজ আপনি করবে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

স্বগত

মৃদু হাতে ছুঁই মুঠি ভরে নিই তোমার ও মুখ
সন্ধ্যাকালে।
প্রান্তর ঘেঁষা মনেরে বুঝাই,
রজনীগন্ধা শত যোজনে ত একটি ফোটে
এখন, যখন
আমারই আয়ুর অলিন্দে এসে কিশোর এ চাঁদ
বাঁশের খোঁচায় জরজর এই বাঁশবাগানে.
গৃহ উপান্তে,
এই মুহূর্তে।
উপন্যাসে কি চন্দ্রালোকে,
বায়ুকুঞ্চিত দীঘি হেসেছিল বাল্যখিল্যের অনাহত
হাসি? অবাক মেনেছি এ নির্বেদে
কুচিকুচি করে ছিঁড়ে-ফেলা প্রেমপত্র এ যে।
প্রেমের এ পথ সুগম ত নয়।
আত্মপ্রসাদ নেই তবু বলি
ভুলে গেছি কবে দেখেছি আকাশ জুড়ে
তোমার বিলোল কটাক্ষ। মোরে হেনেছে
চিন্তা, অনিদ্রা আর তিরস্কৃতি,
তোমার স্মরণ।
মুখে মুখে সব সতীর্থেরা ত ছড়া কেটে গেছে
দেয়ালে এঁকেছে ব্যঙ্গ চিত্র।
লজ্জাই করে।

তবু এ আবির্ভাব।
আগমন নয়। চারুসজ্জার মেখলায় ঘেরা
তোমার চরণ ফুটায় কমল অন্ধকারে।
অদ্ভুত লাগে—চাঁদে-পাওয়া কাক ডেকে যায় বারে-
বারে আকাশের ভদ্র কোণে
কোকিল দুরূহ—
গৌরীশৃঙ্গে তুষার সমাধি পেয়েছে কবে—
বাহাদুরী নয়—দুঃখে জানাই।
বিদূষকও নই। প্রতিদিন আমি অন্ধকারে
অস্তিত্বের পালোয়ানী পেশী সজোরে নাচাই।
মনের উলুকী কর্কশ ডাকে রাত্রি কাঁপায়।
দিনের আলোকে কোনও বন্ধুকে বলি বুক ঠুকে :
প্রেমের ব্যাপারে যৌথ ব্যবসা প্রবঞ্চনারই
সামিল, নতুবা বন্ধুকৃত্যে ক্রটিতালিকার
বোঝা বেড়ে যায়। দুটি বালিকার
মন নিয়ে তুমি বাঁয়া তব্‌লার বোল ফোটাবে কি
এই আসরে!
বন্ধু ছেড়েছি।
অহরহ কোনও প্রেয়সীকে ডাক দিয়েছি জীবনে
উন্মন ক্ষণে।
এদিকে হঠাৎ দুটি পায়ে লাগে বিষম তাড়া—
খেটে খুটে খাওয়া, নিঃশেষ হওয়া ক্ষয়ে যাওয়া
পেশী নিয়ে কি পোষায়?
তবু এ ধাবন কুর্দ্দন যেন সাকাসী ঘোড়া।
তবু এ ভাগ্য লাঞ্ছনা পায় আমারই হাতের প্রবল ন্যায়ে
শ্রমসাধ্যের ঘামে ভেজা মনে, এই প্রান্তরে
তোমার স্মরণ রজনীগন্ধা শত যোজনে ত একটি ফোটে।

নরেশ গুহবক্সি

শরতের ঘাসের একফালি জমি

রাজার আসর প্রমোদ-প্রাসাদ-কক্ষে নয়
ঐখানে, ঐখানে,
শিঞ্জিনী-পরা অলক্ত-রাঙা পায়ে নেচেছিল নর্ত্তকী
যৌবন-লীলা হিল্লোলি' ঐখানে।
অশ্রু-সজল বাষ্পেব মত মেঘ উঠেছিল কোনখানে?
কোনখানে?
ধরণীব মাটি কাঠবিডালির গান শুনেছিল নেপথ্যে ব'সে ঐখানে,
ঐখানে।

সমালোচনা

ঘরোয়া। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব "ঘরোয়া" পড়লুম। চমৎকার বই। ঘরোয়া মানে ঠাকুর পবিবারের ঘবের কথা। আমরা যখন কলকাতায় কলেজে পড়ি তখন এখানে ইংরাজী ভাষায় Gup and Gossip নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হত, যার বাঙ্গলা নাম "গল্প ও গুজব"।

অবনীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা ঠাকুব পবিবারের ইতিহাস নয়, গল্প-গুজব। তিনি অপর আত্মীয়ের মুখে যা শুনেছেন আর নিজে যা দেখেছেন সেই সব কথাই লিখেছেন; তাই বইখানি অতি সুখপাঠ্য হয়েছে। সমগ্র ঠাকুব পরিবার সম্বন্ধে দু'চাব খানি পুস্তিকা আছে যা কেউ পড়ে না। ববীন্দ্রনাথেব মহাপ্রয়াণের পর অনেক কাগজে তাঁর বংশাবলীর পবিচয় দেওয়া হয়েছে; তার থেকে এইমাত্র জানা যায় যে কে কার সন্তান—তার বেশী কিছু নয়।

এ পরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই ধনী পরিবাব হয়ে ওঠে। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধরেরা পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবার আর তাঁর বড় ভাই নীলমণি ঠাকুরের বংশধররা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ, যে বংশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং স্বগুণে স্বনামধন্য, সুতরাং তাঁর কোনও পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি চিত্রবিদ্যায় একজন আর্টিস্ট বলে দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু এ পুস্তকে তিনি নিজের কৃতিত্ব বিষয়ে কোনও কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি ঠাকুর পরিবারের ঘরোয়া কথা বলেছেন। পূর্ব্বে বলেছি এ-পুস্তক ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস নয়, তাই বলে উপন্যাসও নয়

পুরোনো জমিদার বংশের ইতিহাস কিম্বদন্তিতে পরিপূর্ণ, আর সে সকল কিম্বদন্তি অবশ্য বিশ্বাস্য নয়। আমি দু একটি পুরানো জমিদার বংশের বিষয় জানি, যাদের পারিবারিক ইতিহাস পূর্ব্বপুরুষের বীরত্ব ও বিলাসিতার কাহিনীতে ভরপুর, অর্থাৎ romantic। কিন্তু অবনবাবুর "ঘরোয়া" romantic সাহিত্য নয়। যে-সব গল্প-গুজব তিনি বলেছেন সবই নিরীহ। রবীন্দ্রনাথের কবি কাহিনীই পুস্তকের প্রধান কথা ও পাঠকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

যে-সময়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হই, প্রায় সেই সময়েই অবনীন্দ্র-নাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন আমার বয়েস আঠারো আর অবীন্দ্রনাথের বছর পনেরো।

কবির বাল্য জীবনীর বিষয় তখন কিছুই জানতুম না, পরে তাঁর জীবনস্মৃতি পড়ে অনেক কথা জানতে পাই। অবনীন্দ্রনাথ যা আত্মীয়-স্বজনের কাছে শুনেছেন ও চোখে দেখেছেন আমার তা দেখবার শোনবার সৌভাগ্য ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথের বয়েস যখন ২৫ তখন থেকেই তাঁকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি। কোনও দু'জন মানুষের পূর্ব্বস্মৃতি কখনোই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় না। সুতরাং আমাদের উভয়ের স্মৃতির কিছু গরমিল আছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা মোটামুটি সত্য। অবনীন্দ্রনাথ কবির জীবনের ইতিহাস লেখেন নি, মুখে বলেছেন, তাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলফ করে নয়, বলেছেন গল্প হিসেবে। তাতেই তাঁর গল্প গুজব এত মনোহারী হয়েছে। এ গল্প শুনে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হয়। মুখের কথার সঙ্গে লিখিত কথার যে প্রভেদ থাকে, অবনীন্দ্রনাথের এই গল্পের বইয়ে তা সম্পূর্ণ বজায় আছে

অবনীন্দ্রনাথের এ গল্প যখন ছাপার অক্ষরে উঠেছে তখন তা সাহিত্য হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে এর ভাষা। আমি লেখাতেও মৌখিক কথার পক্ষপাতী। কিন্তু আমি কখনও এত চলতি কথা ও বানান ব্যবহার করিনি। অবনীন্দ্রনাথ খেয়ালমাফিক ব'কে গিয়েছেন। সে বকুনির লেখিকাকে বাহাদুরি দিই। তুমি বকে যাচ্ছ, আমি শুনে যাচ্ছি, আর পরে তা লিখে ফেলেছি—এ তো সকলে পারে না। লেখিকা ঠাকুর

পরিবারের ঘরোয়া লোক নন, এবং ও-পরিবারের আবহাওয়ায় বাল্যাবধি বাস করেন নি, সুতরাং তাঁর পক্ষে এ লেখা সহজ হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ লেখিকার নাম যে পুস্তকে জুড়ে দিয়েছেন তা ঠিকই হয়েছে। এ-পুস্তক যে লোকপ্রিয় হয়েছে তার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ও লেখিকার উভয়েরই সমান গৌরব প্রাপ্য। বিশেষতঃ অবনীন্দ্র-নাথ তাঁর গল্প হাঁফ জিরিয়ে বলেছেন, একটানা বলে যান নি। অবনীন্দ্রনাথের বলবার অসাধারণ স্ফূর্তি লেখিকা তাঁর লেখায় সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে লেখিকার কলমে শ্রুতি ও স্মৃতির অপূর্ব্ব মিলন ঘটেছে।

প্রমথ চৌধুরী

গোলাম কুদ্দুস

পঙ্কজ

গাগরী ভাসায় রাধা জলে
রাত বারোটায় পীচঢালা পথে
লোকটা কোথায় চলে

ক্লান্ত শহর তন্দ্রামগ্ন, স্তব্ধ দিনের পাখা
কর্ম্মের নদী নির্জ্জন সরোবর।
অতল সলিলে খসিল আঁচোল কাঁচুলী অঙ্গরাখা
লুপ্ত খণ্ড খণ্ড বালুর চর

বৃত্তাকারেই সর্পিল পথ বারে বারে প্রসারিত
দেহের অতলে হাজার মৃত্যু আসে।
পঙ্ক এখন কেবলি জৈব যাতনা-সশঙ্কিত
পঙ্কজহারা কাঁপিছে শয্যাপাশে।

গাগরী ভাসায় রাধা জলে
মৃত্যুশীতল নূপুরের খোঁজে
বুঝি বা লোকটা চলে।

নীল যমুনার জলতরঙ্গ ক্লান্ত অশ্বখুরে,
ছায়াকদম্ব টবের মৃত্তিকায়,
মুরলীর ধ্বনি মিলায় কলের ঝাঁপির তীক্ষ্ণ সুরে—
দীর্ঘ কেশের তলে ঘুম ভেঙে যায়।

স্তব্ধ আকাশ, শূন্য আকাশ, বন্ধ আকাশ তবু
কোনো কোনো দিন বক্ষ ভরিয়া জাগে,
এখানে ওখানে প্রথম চৈত্রে কৃষ্ণচূড়ায় কভু
বর্ণবিলাসের সুরের আগুন লাগে।

রাধার গাগরী ভরে জলে।
রক্তমুখর নীল যমুনায়
সাঁতার দিয়ে কে চলে।

বিষ্ণু দে

রুমি-কে

কন্যা ! তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা,
নিশ্চিন্ত জেনো মুক্তি, হবেই শ্রেয় জীবন
মরণান্তিক জয়-ভাষায়
তোমরা গড়বে সমান সুযোগে প্রেয় জীবন।

কন্যা ! তোমাকে ঈর্ষ্যা জানাই শুভার্থীর
নবীন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়ে ধ্রুব
ছড়াবে তোমরা কতো শুভ।
ভেবো একবার কতো ব্যর্থতা এ-প্রার্থীর।

অমিয় চক্রবর্তী

রাত্রিযাপন

বুকে প্রাণটা এম্‌নিই রইল, জানো ভাই.
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বল্‌লে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গ'লে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আবার ছড়ালো অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেল বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই

গোলাম কুদ্দুস

একজনের জন্মদিনে

তোমাদের জন্ম হয় তোমাদের জন্ম আসে।
কপোর চামচ নিয়ে তোমাদের প্রসন্ন উদয়,
বেশ ভালো জানি তাহা দিনে দিনে হবে স্বর্ণময়
স্বর্ণমৃগ ভরে দেবে রাঙা পথ কস্তুরী সুবাসে।
আমাদের জন্ম নেই আমাদের জন্মদিন নেই।
জীবনে এসেছে শুধু কুমারী মেয়ের ভ্রূণ সম,
আমাদের দ্বারপ্রান্তে জন্মহীন মৃত্যু মধুরম
পিতৃহীন জন্ম হাসে চিহ্নহীন মৃত্যু বরণেই।

আমরা কুমারী ভ্রূণ মরে যাই বিদ্ধ ক্রুশ পরে।
জারজ কণ্টকে পুষ্প আছে কি না আছে কোনো দিন
দেখবার অবসর হবে না এ উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে।
ঝুলে যাই রজ্জুপাশে, খুলে যায় মৃত্যুর পঞ্জরে
স্বর্ণ নষ্ট জন্মের অর্গল। ক্ষুরাতুর বাক্য শীৎ
আশীর্বাদ দেবে বুঝি আশা করি, জন্মের কুক্ষণে।

অশোকবিজয় রাহা

ভাঙ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুম

ভাঙ্‌ল যখন দুপুরবেলার ঘুম
পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃঝুম
বিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে
গাছে পাতায় ঘাসে

হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস —
কানের কাছে কে করে ফিসফিস ?

চম্‌কে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী !
পাশেই আমার জান্‌লাটাতে পরির শিশু দু'টি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি ।
অবাক্ কাণ্ড—আরে !
চারটি চোখে ঝিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে !
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুক্‌রো দু'টি,
পিঠের 'পরে পাখার লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—
কচি পাতার বাঁশি—
একটু পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠি মুঠি
রাংতা-আলোর বুটি ।

এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক,
একটু গেল ফাঁক,—
এক ঝলকে আরেক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে,—
তারি ফাঁকে পাৎলা রোদের পর্দাটুকু ফুঁড়ে
এরাও গেলো উড়ে,
রইলো প'ড়ে ঝরা পাতা, রইলো প'ড়ে ঢালু,
পাহাড়-ধসা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু ।

নরেশ গুহ

স্বগত

এ পৃথিবীতে এলাম
কিসের অধিকার পেলাম ।
চালে খড় নেই, পুকুরে পাঁক
আকাশে বাজে মশার ঝাঁক ।

চায়ের বাটি তাও খালি—
নির্দোষ নেশা করব যে পেশা
সে গুড়ে বালি।

সমালোচনা

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী দেবী। ডি. এম. লাইব্রেরি, ৩৷৷০।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে-ক'টি ভালো বই বেরিয়েছে, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। অবশ্য রানী চন্দ-র 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র মতো এ-বইটিও রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলাপ-আলোচনারই সংগ্রহ। তবে 'আলাপ-চারী'র চাইতে এটি আকারেও বড়ো, বস্তুতেও অনেক বেশি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে কয়েকবার মংপু শৈলাবাসে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন; সেই সময়ে কবি যে-সব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, মৈত্রেয়ী দেবী প্রশংসনীয় ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে সেগুলি তাঁর ডায়েরিতে নোট ক'রে রাখতেন—তাই থেকে এ-বইয়ের জন্ম। কবির মুখের কথাগুলি একেবারে জীবন্ত-রূপে পরিবেষণ করা হয়েছে, পড়তে-পড়তে তাঁর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি শুনতে পাই-- এ-গুণটি রানী চন্দ-র বইয়েও লক্ষ্য করেছিলাম।

এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের বহুমুখী উজ্জ্বলতা এ-বইয়ে যেমন ফুটেছে তেমন অন্য কোনো বইয়েই নয়। ভাষার অপূর্ব শালীনতা; হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত দ্যুতি; অবিশ্বাস্য ready wit; কথা নিয়ে এমনভাবে খেলা করা, যাতে চেষ্টার কি শ্রমের চিহ্নমাত্র নেই; লঘু থেকে গুরুতে, গভীরতা থেকে পরিহাসে মনকে একটুও ঝাকানি না-দিয়ে লাইন-বদল করা; সর্বোপরি, ক্লান্ত না-হ'য়ে ও না-ক'রে বহুক্ষণ ধরে অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা—এই সবগুলি লক্ষণই মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর অনুলিপিতে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে ও প্রকাশ করতে পেরেছেন, এটা কম কথা নয়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কথক হিসেবে কোলরিজের খ্যাতি আকাশচুম্বী; শোনা যায় যে-কোনো সময়ে দু'তিন ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রান্ত কথা বলা তাঁর কাছে ছেলেখেলা ছিলো, আর সে-কথা এমনই যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতো, এবং শোনবার পরেও বহুদিন তার ছাপ মন থেকে মুছে যেতো না। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কথকতাও ঐ স্তরে পৌঁচেছিলো এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা দুটি কারণে ইদানীং তাঁর কথা বলা প্রায় বিশুদ্ধ

স্বগতোক্তি হ'য়ে উঠেছিলো। প্রথমত, তাঁর কাছে এসে স্বাধীনভাবে কথা বলা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'তো না (যদিও মৈত্রেয়ী দেবীর বই প'ড়েই জানা যায় যে এমন লোকও ছিলো যারা তাঁর কাছে এসে অজস্র বাজে বকতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না) ; দ্বিতীয়ত, তাঁর শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো ব'লে আগন্তুকদের তিনি কথা বলবার সুযোগই কম দিতেন, নিজেই সবটুকু সময় কথা দিয়ে ভ'রে রাখতেন। তাই তাঁর শেষজীবনের কথা কোলরিজের কথার মতোই শ্রোতাদের উপলক্ষ্য ক'রে আপন মনে বলা, সেইরকমই দীর্ঘস্থায়ী—এবং তার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য যে কতখানি তা আমাদের প্রত্যক্ষভাবেই জানবার সৌভাগ্য হয়েছে। আন্তরিক সম্পদে অত্যন্ত ধনী হ'লেই এ-রকম কথা-বলা সম্ভব। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে অনেকে একসঙ্গে বসলে তবেই আড্ডা জমে, কথোপকথনে সবাই কিছু-কিছু চাঁদা দিলে তবেই আমাদের আনন্দের ভাণ্ডার ভ'রে ওঠে। কথোপকথন জিনিসটা স্বভাবতই অস্থির, মুখ থেকে মুখে অবিশ্রান্ত ঘোরাফেরা না-করলে তার মধ্যে সেই রস জ'মে ওঠে না যার ফলে তা সকলেরই পক্ষে উপভোগ্য হয়। খুব জমাট আড্ডার মধ্যেও কোনো একজন লোক নিজে কিছু বলবার সুযোগ যদি না পায়, তার পক্ষে সে-আড্ডা নীরস হ'য়ে ওঠে ; দুজনের কথাবার্তা বেশিক্ষণ চালানো শক্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাই একশো ; তাঁর দীর্ঘ সুসম্পূর্ণ জীবন তাঁকে কথা বলার কোনো-না-কোনো বিষয় সব সময়েই জুগিয়ে যেতো, আর ভাষার উপর তাঁর তো রাজকীয় কর্তৃত্ব। তাই আগন্তুকরা শুধু তাঁর কথা শুনেই সম্মোহিত হ'তো, নিজেরা বিশেষ কিছু বলছেন না ব'লে কোনো অভাববোধের স্থানই ছিলো না।

কথকতায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এ-বইতে রইলো। আমরা খুশি হয়েছি, উত্তর পুরুষ কৃতজ্ঞ হবে। নানা বিষয়ে কথা আছে, কোনো-কোনো অংশ জীবনী-উপাদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, কোনো-কোনো অংশ গভীর-ভাবে মর্মস্পর্শী। কবি যেখানে তাঁর পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুর কথা বলছেন, তার তুল্য কোনোখানে কিছু পড়িনি। আর সব জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের যে-ছবিটি পাই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আবার নতুন ক'রে আমাদের মাথা নত হয়। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখনীচালনা সার্থক হয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে আমার একটিমাত্র অভিযোগ আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্দেশে 'রবীন-খুড়োর কাব্য' ইত্যাদি কবি-মুখের বিদ্রূপ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। কথাটা হয়তো শ্রুতিকটু, কিন্তু বলতেই হয় যে এতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে ঈষৎ

ছোটো করা হয়েছে। অনেক কথা আছে যা অলস মুহূর্তে ঘরোয়া কথাবার্তায় বেশ মানিয়ে যায়, কিন্তু প্রকাশ করতে গেলে বিসদৃশ হ'য়ে পড়ে। এগুলো ছাপার অক্ষরে টেনে আনার দরকার ছিলো না। এটা আমি আধুনিক লেখকদের মান বাঁচাবার জন্যে বলছি না (তাঁদের মধ্যে মাননীয় কিছু থাকলে সেটা কিছুতেই চাপা থাকবে না), রবীন্দ্রনাথেরই চারিত্ররূপের সত্যতার দিক থেকে বলছি। তাঁকে আমরা যে-ভাবে দেখেছি, যে-ভাবে তাঁকে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত, এই ব্যঙ্গোক্তি-গুলি আমাদের সেই ধারণাকে আঘাত করে, তাঁর মহত্বকে খর্ব করে। একটা ঘটনা এ-বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে। কোনো একজন 'নাম-চেনা আধুনিক কবি'র লেখা বিষয়ে কবি বলছেন: 'আমি তো প্রায় মিনিট দশেক ধরে চেষ্টা করলুম, প্রত্যেকটা লাইনের অর্থ একরকম ক'রে হয়, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য লাইনের যে কি যোগ তা কবি জানেন কিংবা তাঁরও অন্তর্যামী। তুমি যদি বলতে পার, আমার স' পাঁচ আনা সমেত কলমের বাক্সটা নিশ্চয় তোমায় দিয়ে ফেলব।'

লেখক বলছেন, 'দেখুন আপনি নিজে একদিন এর লেখার কি প্রশংসাই করে-ছিলেন, এখন এইরকম বলছেন?'

কবি। 'কি করব—বল্লে ভালো, আমি ভাবলুম, নিশ্চয় ভালো।'

তাহ'লে কি রবীন্দ্রনাথ নিকটবিহারীদের কথা অনুসারে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত দিতেন? যে যখন কাছে থাকতো তার মতেই মত দিতেন? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরকম একটি ধারণা মুহূর্তের জন্যও সাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী গুরুদেবের প্রতি অবিচার করেছেন এ-কথা আমাকে বলতেই হ'লো। কোনো জিনিস নিয়ে শুধুই ব্যঙ্গ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিলো, আধুনিক সাহিত্য নিয়েও তা করেননি। মংপুতে ব'সে কি কেবলই রবীন-খুড়োর কাব্যের মতো তাঁর অযোগ্য ব্যঙ্গ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আর কিছুই বলেননি?

রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু বলেছিলেন, লেখক হয়তো তার সবই নোট করেননি, এবং যা নোট করেছিলেন তারও সবটাই হয়তো এ-বইয়ের অন্তর্গত করেননি। উপাদানের নির্বাচনে লেখকের পক্ষপাতিত্বই ধরা পড়ে। এ-বইয়ে আধুনিক লেখকদের উদ্দেশে কেবল ঠাট্টাই কেন আছে, তার কারণও আবিষ্কার করা শক্ত নয়। বইটি আদ্যো-পান্ত পড়লে বোঝা যায় যে আধুনিক লেখকের প্রতি মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের প্রবল প্রতিকূলতা। বইয়ের শেষের দিকে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন: 'সত্যিই আমি ভেবে পাইনে, [রবীন্দ্র] প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এরকম আপ্রাণ চেষ্টার দরকার কি? সহজে যদি কারও লেখা অন্যরকম হয়ে ওঠে, সে যদি সুশ্রাব্য হয়, ভালই তো।

কিন্তু তার জন্য এত চেষ্টা, এত বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ...কি দরকার ? ভালো জিনিসের প্রভাবে ক্ষতি কি ? মন্দের প্রভাব থেকে বাঁচাবার সে একটা কবচও তো বটে।' কিন্তু কেন যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এত বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ দরকার, এ প্রশ্নের উত্তর মৈত্রেয়ী দেবীই নিজের অজান্তে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হবার কিছুমাত্র চেষ্টা না-করলে তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় এই বইয়েরই ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতাটি তারই নমুনা। যে-কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রায় চেনাই যায় না, অথচ যা রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, সে-কবিতা লিখলেই বা কী না-লিখলেই বা কী ?

যা-ই হোক, 'রবীন-ধুত্তোর' সাহিত্যের বিষয়ে জানবার জন্য এ-বই কেউ পড়বেন না, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর অনুশীলন যাঁরা করবেন এ-বই তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করবে। কবির অনেক রচনার ইতিহাস এখানে পাওয়া যাবে ; সাহিত্য, সমাজ, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর সব-চেয়ে পরিণত মতামত এখানে একত্রিত , একটি কবিতা কী-ভাবে তাঁর প্রথমে মনে আসতো, এবং কী-ভাবে বার বার অদল-বদল হ'তে-হ'তে তার শেষ রূপটি গ'ড়ে উঠতো, যার সঙ্গে প্রথম খসড়ায় প্রায় কোনো মিলই থাকতো না, কবি ও সমালোচকেব পক্ষে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এই ইতিহাস এখানে বিবৃত। তাছাড়া, কবির জীবনী সংক্রান্ত অনেক ঘটনা বিক্ষিপ্ত আছে, কোনোটি কৌতুকাবহ, কোনোটি গভীব ব্যঞ্জনাময়। ২৫৬ পৃষ্ঠায় একটি ভুল পেলুম।

তিনু গোয়ালাব গলি
লোহার গরাদ দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধাবেই—

এই কবিতাটি গদ্যকবিতা, এবং এটি 'পুনশ্চ' গ্রন্থে আছে, এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের মুখে উক্তি আছে। কিন্তু এটি গদ্যকবিতা নয়, পয়ারছন্দে লেখা, এটি 'পুনশ্চে' নেই, আছে 'পরিশেষে', গোয়ালার নাম কিনু, তিনু নয়।* জানি না এ ভুল রবীন্দ্রনাথেব না মৈত্রেয়ী দেবীর। নিজের লেখার নাম-ঠিকানা কবি অনেক সময়ই হারিয়ে ফেলতেন, অসতর্ক মুহূর্তে এ-রকম বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু এই ভুলকে ছাপার অক্ষরে ভুলই রাখা কি সঙ্গত হয়েছে ? তাছাড়া, মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের উক্তির মধ্যে 'জীবনের জীবনীপ্রবাহ' 'আনন্দে আনন্দিত' 'স্বাভাবিক স্বভাব'

*রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ড প'ড়ে জানলাম যে এই কবিতাটি 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চ'র দ্বিতীয় সংস্করণে বদলি হয়েছে।

এ-ধরনের ভাষা পীড়াদায়ক ; 'পুনরাভিনয়', 'সত্বা' 'তত্ব' 'বধূ' 'দায়ীত্ব', জগৎ-ব্যাপি' ইত্যাদি বানানভুলগুলিতেও সৌষ্ঠবের হানি হয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'নিজ অর্থ না জানে' পংক্তিটি ছন্দ-চ্যুত, অনুলিপিতে বা মুদ্রণে ভুল হয়েছে বলে মনে হয়। ১৬৫ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পর্বের গোড়ায় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এই তারিখের তলার লেখা আছে, '...গুরুদেব ১০ই সেপ্টেম্বর মংপু পৌঁছবেন।' কথাটার মানে ঠিক বোঝা গেলো না, ছাপার ভুল নিশ্চয়ই ?

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্র-সঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গান বলতে আমরা কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল বা রাম-প্রসাদী এই রকম এক-একটা বিশেষ সুরের বিশেষ শ্রেণীর গানকেই বুঝতুম। কেবলি বাংলাদেশের 'বাংলা গান' নামে কোনো গান ছিল বলে জানি না। বোধ হয় প্রথম রবীন্দ্রনাথই আনলেন আমাদের সেই মুক্তি। অবিশ্যি এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্র-লালও আমাদের স্মরণীয়। পরবর্ত্তী সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে নজরুল ইসলামেরও একটি বিশিষ্ট আসন আছে।

কিন্তু বৈচিত্র্যে এবং অজস্রতায় রবীন্দ্রনাথ এতই উপরে যে আর কারো সঙ্গেই তাঁকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। এবং তাঁরই জন্যে আজকের দিনে বাংলা গান আর অবহেলার যোগ্য নেই। নিতান্ত উন্নাসিক গায়কেরাও আজ রবীন্দ্রনাথের গানকে এক অভিনব সৃষ্টি বলে স্বীকার করেন।

সকলেই বলেন যে বাংলা গান স্বভাবতই বাণীপ্রধান, এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাণীসিদ্ধ পুরুষ। তাঁর গানের অতুলনীয়তা সেখানেই। আমাদের সুখ দুঃখের বাহনই আমাদের ভাষা। অনেক সময় দেখেছি—একখানা হিন্দি গান গেয়ে যেখানে কাউকেই সুখী করতে পারিনি সেখানে ঠিক সেই সুরেই যেমন-তেমন কয়েকটি বাংলা কথা বানিয়ে দিলেই শ্রোতারা বাহবা দিয়ে উঠেছেন। কাজেই বাংলা দেশে সঙ্গীত-রচয়িতা রূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ক্ষুধিতের মুখে অন্নের মত। তিনি যেন আমাদের মর্ম্মস্থানে এসে আঘাত দিলেন। এত প্রাচুর্য্য যেন আমরা বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না। বোধ হয় খানিকটা সেই কারণেই প্রথম প্রথম তাঁর গান আমরা ঠিক গ্রহণ ক'রে উঠতে পারিনি। এমন অনেক গাছ আছে যতই জল ঢালো আর মাটিতে যতই সার দাও রস শোষণের ক্ষমতাই তার থাকে না। অথচ একটা পোড়ো

মাঠের মধ্যে যেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই সেখানেও একটি গাছ হয়তো ফলে ফুলে ভরে ওঠে। কোনো-কোনো প্রাণশক্তির রস গ্রহণের ক্ষমতাই অত্যন্ত প্রবল থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে গান-বাজনার বিশেষ প্রচলন ছিল ব'লে তিনি তাঁর সৃষ্টির মুখে অনুকূল হাওয়া পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আসল কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের ছিলো সেই বিরল প্রাণশক্তি, আবহাওয়া থেকে রস শুষে নেবার ক্ষমতা যার অসীম।

ভারতীয় সংগীতের যাঁরা আদি স্রষ্টা তাঁদের নাম আমরা জানি না. কেননা সে সময়ের কোনো ইতিহাস নেই। পল্লবিত হয়ে নানা গল্প নানা লোকের মুখে মুখেই রচিত হয়েছে, আর সে-সব শুনেই আমাদের কৌতূহলকে তৃপ্ত করতে হয়। আর তারপরে কত শত বছর ধরে আমরা সেই গানই গেয়ে এসেছি—তার মধ্যেই হয়তো কোনো প্রতিভাবান গায়ক কিছুটা রকমফের করেছেন। সেই গান গেয়েই অনেক সুধাকণ্ঠ আমাদের মুগ্ধ করেছেন কিন্তু নতুন কোনো আস্বাদ তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি। সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা বলে গণ্য।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সংগীত' বইখানি পড়ে খুবই আনন্দ হলো। এ রকম একখানা বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

এর আগে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এতখানি বিশদ আলোচনা বোধ হয় আর কেউ করেননি। শান্তিদেববাবু অনেকদিন ধ'রে রবীন্দ্র-সংগীতের সাধনা করছেন, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংশ্রব ছিলো. তাই বইখানা ভাবের দিক থেকে উজ্জ্বল ও তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান হয়েছে লেখক কোনো-রকম পারিভাষিক জটিলতার মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে যাননি. সহজ ভাষায় সকলের জন্য লিখেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যের প্রধান সূত্রগুলি ধরিয়ে দেয়াই তাঁর চেষ্টা। কোন গান কী উপলক্ষ্যে বা কোন ঘটনার প্রতিঘাতে লিখিত এ-খবর-গুলো আমাদের পক্ষে অত্যন্তই ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল. এ বইটি পেয়ে অনেকখানি তৃপ্তিলাভ হল সন্দেহ নেই।

প্রাচীন রাগসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের সম্বন্ধ. তার সুরে বৈদেশিক প্রভাব. তালের দিকে তাঁর অভিনবত্ব, গীতিনাট্যে তাঁর অতুলনীয়তা -এই সমস্ত বিষয়েই শান্তিদেববাবু আলোচনা করেছেন। কাব্যের ও সুরের দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে আরো বই আমাদের ভাষায় নিশ্চয়ই লেখা হবে, বিষয়টি এত ব্যাপক যে এ নিয়ে আরো অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু এ-বিষয়ে প্রথম বই, এবং প্রথম ভালো বই হিসেবে 'রবীন্দ্র-সংগীত' উল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো।

দু' একটা জায়গায় আমাদের একটু খট্‌কা লেগেছে, তার উল্লেখ করি। শান্তিদেববাবু এক জায়গায় লিখেছেন 'জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের গানগুলোই বেশী ভাল লাগে।' কথাটা কি ঠিক? তাঁর অতি তরুণ বয়সের 'মায়ার খেলা' অবশ্য আশ্চর্য্য রচনা, সুর ও কথা দু'দিক থেকেই—কিন্তু তার পরের পর্যায়ে ব্রহ্ম সংগীতের যা সুর তাতে কোনো রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করবার পরেই রবীন্দ্রনাথের গান 'রবীন্দ্রসংগীত' হয়ে জাত নিল এবং সে-সব গানের বেশীর ভাগই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের রচনা। যাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ 'রবীন্দ্রসংগীত,' তাতে কথা ও সুরের একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে, সেই মিলনেই সে-গানের চরম সার্থকতা।

তা ছাড়া একথাও বোধ হয় ঠিক নয় যে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা রচনায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় যে যুক্তাক্ষর কম তার কারণ যুক্তাক্ষরের রহস্য তিনি তখনো আবিষ্কার কবতে পারেন নি, পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালি কবিরা যুক্তাক্ষরের ব্যবহার জানতেন না। বাংলা ছন্দের মাধুর্য্য যে যুক্তাক্ষরের উপরেই নির্ভর করে, এ-আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথেরই, এবং গানে যে যুক্তাক্ষর অপাংক্তেয় আমাদের এই বহুকালের কুসংস্কার থেকে রবীন্দ্রসংগীত আমাদের মুক্তি দিয়েছে। অবিশ্যি শান্তিদেববাবুও রবীন্দ্রনাথের যুক্তাক্ষরবহুল গানের উল্লেখ করেছেন; জীবনের কোনো সময়েই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা বললে ঠিক কথাটি বলা হয় না এটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য।

বইটি দেখতেও সুন্দর। প্রচ্ছদপদটি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা। তবে ছাপার ভুল অজস্র, বিশ্বভারতীর প্রকাশিত কোনো বইতে এত ছাপার ভুল দেখিনি। এই ভুলগুলোর যাতে শোধন হয় সেইজন্যেও বইটির তাডাতাডি দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া উচিত।

প্রতিভা বসু

অমিয় চক্রবর্তী

সমালোচকের জল্পনা

পরিচয়

পরিচয়ের কাজটাকে বাদ দেওয়া চলে না। লোকটি কে হে?—যদি বলা যায় তাঁর জামার বোতামটা অসহ্য; তাঁর পিসীমা ভালো লোক নয়; তাঁর চোখের শূন্য দৃষ্টিতে,—"শূন্য" অর্থে চার্ব্বাক দর্শনের...; বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি পর্শুদিন তিনি স্বপ্নে তিনটে ফ্রয়েডিয়ন্ ঘোড়াকে...; তাহলে প্রশ্নটা শূন্যেই থেকে গেল। তথ্যের তির্যক চাহনি, তত্ত্বও নয়, তাঁর পরিচয় চেয়েছিলাম। আমি যে তাঁকে চিনিই না। অমুক বাবুর প্রসঙ্গে যদি প্রথমেই জানাও তিনি "প্ররোহ" কথাটা ক-বার ব্যবহার করেচেন তাহলে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ব্যর্থ হবে। রিপোর্টর-বৃত্তির খণ্ডবিজ্ঞান ভয়াবহ, তারই ছোঁওয়া সর্বত্র দেখতে পাই। ভদ্রলোকটি সাড়ে বত্রিশ ভাজা খান কিনা, তাঁর বাড়ি কোন্ বস্তির পাশে, চা-বাগানে কত সুদ পান এর মধ্যে বিশেষজ্ঞের বিশেষ অজ্ঞতার সন্ধান মেলে। সৌখীন শিল্পরসিক আশ্চর্য সমাচার দিলেন, জানোনা?—আসল খবর দিচ্চি। ওঁর নাকটা মোটেই রোমান্ নয়—দেশী তিলপুষ্পের সঙ্গেও মিল্‌চে না—সব ফাঁকি, আর ওঁর পায়ের গোড়ালির সাইজ প্রাচীন গুয়াটিমালার গুহাচিত্রের...। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো হোলো। কাকে বোঝাই পরিচয় মেলে নি। চেনার পর্বে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও দুর্নৈতিক, নিরর্থক। এমন কি অমুকের পলিটিক্সও মগজে মজ্‌ল না; তাঁকে সামাজিক তৌল ক'রেই বা কেন দেখ্‌ব। আমাকে তাঁর পাণ্ডার নাম বোলোনা।

অথচ লোকটিকে চিনলে এর অনেক কিছুই চাই। দর্শন বিজ্ঞান লোকতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব কোনোটাই দোষ করে নি। নূতন বই চেনাবার বেলাতে তাই। নানা প্রসঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে বাধা নেই, কিন্তু পরিচয়ের সুরটুকু ধরাও। সেই দায়িত্বটা সমালোচকের, যেহেতু আমি বইটা পড়ি নি, তিনি পড়েচেন। মন্তব্যের কেন্দ্রে বইয়ের চেহারা ফুটিয়ে তোলা সংবেদনশীল কলমের সাধ্য; সেই লেখনী যাঁর আছে তাঁকেই বলব আশ্চর্য্যে বক্তা, অর্থাৎ খাঁটি রিভিউ-লেখক।

সদ্য বইয়ের সমালোচনায় আমরা পনেরো আনা অসংলগ্ন তর্ক চাপিয়ে, বিসদৃশ তুলনা এবং অস্বচ্ছ সংজ্ঞার আড়ালে আলোচ্য গ্রন্থকে চাপা দিই। বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েচে গ্রন্থবিস্তার, অর্থাৎ বাক্-বাহুল্য। কাগজের দাম বেড়ে তাহলে

ভালোই হোলো। অত্যুচ্চ আমি-র স্তূপে দাঁড়িয়ে বিশেষণ প্রয়োগকেই বা কোন্ জাতীয় সমালোচনা বল্‌বে? অবশ্য একরকমের কৌশলী লেখা আছে, তাতে নিজেকে নিয়ে রহস্য করতে বা সোজাসুজি নিজের কথা বল্‌তে বাধা নেই, আত্মগোপনেরও একটি পন্থা ঐ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা নয়। ছাপার ভুলকে বলি মুদ্রাযন্ত্রের দোষ, এর নাম হচ্চে মুদ্রা দোষ। আমি বল্‌চি, আমাদের অভ্রান্ত মত, আমার গুরু বলেচেন, আমি, আমি। যিনি লিখচেন তিনি নিজেরই কথা লিখচেন সে-কথা না লিখ্‌লেও চল্‌ত। যে-বইয়ের কথা লেখা হচ্চে তারও বিষয়ে জানা দরকার। সমালোচকের দৃষ্টি তাঁর দর্শিতের মধ্যে চারিয়ে যাবেই; তাতে পাঠকের দ্বিগুণ লাভ। তাঁর চোখে দেখ্‌ব ব'লেই তো ভিড় ঠেলে আসি। সশরীরে তাঁর আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দৃশ্যের ব্যাঘাত হয়। পরিচয়দাতার এও একটা স্মর্তব্য।

এখানে বলা উদ্দেশ্য নয় যে সমালোচককে পরিচয় ঘটানোর রীতি-রক্ষা করতেই হবে। রীতিটা তাঁরই স্বকীয় হোক্; কিন্তু চেহারা ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব ত্যাজ্য নয়, তারই অভাবে আমাদেব গ্রন্থবিচারে অবাস্তবতা ঘটচে। যেমন অতিবাস্তবতা ঘটচে সস্তা পারস্পরিক সমালোচনার নিম্নক্ষেত্রে; ব্যক্তিগত চর্চায় ব্যক্তিকে হারানো। কোনোটাই বাস্তব নয়।

সৃষ্টির পরিচয়সৃষ্টি করতে যে-বিশেষ প্রসাদগুণ চাই তাকে বল্‌ব সমালোচনার পরিচয়শিল্প।

গাড়িতে সেদিন ভদ্রেশ্বর পার হয়ে একটু বৃষ্টি নাম্‌ল। সেই খঞ্জ বৈষ্ণব ছেলেটি পয়সার ভাঁড় এক হাতে তুলে ভাঙা তারস্বরে গান ধ'রেচে—লোহার চাকার চল্‌চে খটাখট্ বোল—ওরি মধ্যে ডেলি প্যাসেঞ্জরদের মনে আমেজ লাগ্‌ল। কে একজন সিনেমার গল্প জুড়েছিল, একদিকে চুল-চেরা তর্ক চল্‌ছিল হাওড়ার নতুন ব্রিজের নিক্তির হিসাব-মেলানো দাম নিয়ে। বই-পড়িয়ে কে একজন বলে উঠ্‌ল, এমন নাটক পাঁচশো বছরে লেখা হয়নি। তার ইস্কাবনের টেক্কাটা হাতেই রয়ে গেল, তুরুপ করা হোলোনা; দেখা যাচ্চে নাটকটা নিয়ে সে খামকা লড়তে প্রস্তুত। কিসের বই? কার বই? —তাসের আড্ডায় পাঁচজনের প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুনতে পাওয়া গেল লেখাটা নিশ্চয় ভালো, নিশ্চয়তম ভালো। সরিৎবাবু খানিকটা জানতেন, তিনি মাথা নেড়ে রায় দিলেন সপ্লই ডিপার্টমেণ্টের টামো-চড়া মেয়েদের আর বর্মার কী একটা কাণ্ড নিয়ে আধুনিক সাম্যবাদী তর্ক জুড়লেই কি বই হয়।—আরেকজন চটে উঠে বল্‌লেন, কেন মশায়, বর্মা-ফেরৎ চৌধুরী পরিবারের কথাটা কি পড়েননি মশায়; প্রোম্ পেরিয়ে জঙ্গলের বর্ণনাই বা কি কম, সাংঘাতিক বর্ণনা,

সাংঘাতিক। আলিপুরের উকীল একজন চুপ ক'রে বসেছিলেন, তিনি গল্পটার মূল তত্ত্ব এবং গভীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কী বোঝালেন কেউ বুঝতে পারলাম না। গুছিয়ে মোট কথাটা ধরিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল কেবল ঐ ফর্সট্-এড্ কেন্দ্রের মুখ-চোরা ছেলেটার। অল্প বাক্যে সে পরিচ্ছন্ন এমন একটি চেহারা এঁকে দিল, আজকের কলকাতায় নানাদেশীয়ের সমাগমে অচেনা হাওয়া, তারো চেয়ে নূতন আব্‌হাওয়া যা কর্মনিষ্ঠ ছেলে-মেয়েদের মনে জাগ্‌ল, সপ্লাই বিভাগের মেয়েটি শুনেছিল কোন ডাক, নিরাশ্রিত রুদ্ধকণ্ঠ বর্মা-ফেরৎ নরনারীদের কণ্ঠে। সেই তার মেটেবুরুজে সকালে এবং সন্ধ্যায় কাজ, সারাদিন আপিসের পরে রাত্রে কুপির আলো নিয়ে ইভাকুয়া ক্যাম্পে ঘোরা, টিনের ঘরটায়—পাশেই প্রকাণ্ড কালো বটগাছ হাজার শায়িত যাত্রীর মধ্যে চৌধুরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ। সুতোর সঙ্গে সুতো বাঁধা, বর্দ্ধমানের কমলা চৌধুরীর প্রাচীন ভিটেয় তাঁর সঙ্গে গেল মেয়েটি, শনিবার দুপুরে নাম্‌ল ঝড় বোমা-পড়া কলকাতার সমস্ত ভিড়টা কি জমেছে রাত্রের হাওড়ায়, হেঁটে আস্‌তে হোলো বালিগঞ্জ পর্যন্ত। রাস্তায় এতগুলো চায়ের দোকান হয়েছে এই ক-মাসে, সৈন্যর ক সব সময়েই খাচ্চে - অবশ্য একই লোকরা নয়—ভয়ে ভয়ে একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে লেমনেড্ চাইল। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়েছে হঠাৎ এক সময় কী এক জটলা গোলমাল, দুজন শিখ, চারজন সৈনিক তাড়াতাড়ি দাম চুকিয়ে, আর গেলাস খেয়েই সে উঠে পড়ল ভদ্র একটি মার্কিন কর্মচারী এগিয়ে এসে বললেন আপনাকে খানিকটা পৌঁছে দেব। এল্‌গিন রোড পর্যন্ত গেলেন -এর মধ্যে বোমা, বর্মা বিমানবিহারী অভিজ্ঞতার কিছু বল্‌লেন। পরে চলেন প্রোম্‌-এরই কাছে খনিজ কারখানায়। প্রোম্? কথায় কথায় বেরোল চৌধুরীদের কথা কমলা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে—যার ষ্টীমার কোম্পানীর মাথায় দুপক্ষেরই বোমা পড়েছে তার শেষ খোঁজ দিলেন। 'চনদ্বায়ন-এর ধারে তাকে দেখেছেন সঙ্গে তার বর্মীয় বন্ধুটিও ছিল সেই বন্ধুটির ছোটো ছেলেটা কাছেই জঙ্গলে মারা গেছে, সাতদিন হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে আর পারেনি। নাটকের শেষাঙ্কে কিছু রোমান্স আছে, চৌধুরী ছেলেটি কালো রাস্তায়' হেঁটে ডিমাপুর পৌঁছল, কলকাতায় তার আগমনীর অশ্রুত সানাইয়ের সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল জন-আন্দোলনের প্রচণ্ড ঐকতান। ডকে জেটিতে লক্ষ মজুর বেরিয়ে এসেছে—উষনা--যার নামে নাটিকারও নাম—নারীবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। ভাঙা বর্মা - প্রলয় কলকাতা —নূতন বাংলার অগণ্য বুকে লেগেছে যুদ্ধজয়ী স্বাধীন চীন রাশিয়ার ঢেউ--থরথর করছে সহর—উঠছে নিশান এদিকে চলন্ত ট্রেনের জান্‌লায় বৃষ্টি থেমে গেছে,

লিলুয়ার লোহালক্কড়ের উপর রোদ পড়েচে।—দূরে কলকাতার ধোঁয়াটে অদৃশ্য প্রকাণ্ড আকাশ। যেন এরি মধ্যে তার বিশেষ গন্ধটা নাকে এসে ঠেক্‌ল। গাড়ির মধ্যে অন্তত তিন জন লোক ঠিক করেচে ঐ বর্মাই নাটকটা কিন্‌ব; বাঁশতলা স্পোর্টিং ক্লাবের দুটি যুবক, হাওড়ার রেলোয়ে আপিসে তাদের চাকরি, চাঁদা তুলে বইটা আনাবার ফন্দি এঁটেচে। কুঞ্জেশ্বর বাবু অভিনয় করাবার কথা ভাবচেন, থিয়েটরের সখ।

বর্ণনায় ব্যঞ্জনায় আলোচনায় সমালোচনা। নাটকটির পরিচয় দিতে ছেলেটির পনেরো মিনিটও লাগেনি। কিন্তু তার চোখের তেজে ছিল তীক্ষ্ণ মন্তব্য, গলার আওয়াজে দরদ, কথার চয়নে এবং ভঙ্গীতে নিজত্ব। যদি লিখ্‌তে পারত হোতো ভালো রিভিউ-লিখিয়ে।

২

ব্যবহার

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের সূত্রপাত। দু এক মিনিট কথা ক'য়েই প্রচলিত কুশল সংবাদ ফুরোয়--কুশল নেবার বিধিটা সুন্দর এবং প্রশস্ত—তখন আপনা হতে সুরু হয় মনের বিনিময়, সম্বন্ধ বিচার। অমুকবাবু বা অমুক গ্রন্থের সমালোচক যদি যাচাই করবার কালে সৌজন্য রাখেন--মৌখিকতার নয় বল্‌বার ধরণে — তাহলে পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হবে না। কুলশীলের বার্তা আমাদের কাছে জরুরি নয়, মন্দাক্রান্তা ছন্দ বা উপমা কালিদাসস্য বজায় রেখে কাব্য বেঁধেচি এই বিনীত অহঙ্কারে নূতন কবি পার পাবেন না; আভিজাত্য স্বকীয়তায়। দেশকালপাত্র, চেহারা, বেশভূষা, চালচলন কোনোটাই মনকে এড়ায় না —সব নিয়ে বোঝা যায় নবপরিচিতের ব্যবহার কীরকম। ভেবে দেখ্‌ব তাঁর কথাবার্তার উদ্দেশ্য কী।

কিন্তু স্বকণ্ঠের উদ্দেশ্য ঘোষণায় লোকটির সমস্ত কথা প্রকাশ পায় না; তিনি যা তাই দেখ্‌তে থাকি, সেটা মুখের কথার চেয়ে বেশি। প্রপাগাণ্ডা এইজন্যে আর্টের শত্রু, অত্যন্ত জানাতে চায় কিছু বলা হচ্চে। তাতে বলা হয় কম। যেমন হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান করা: গান না হলেও চলে। আওয়াজই হয় উদ্দেশ্য। কাব্যলোকে উদ্দেশ্যের চেয়েও বড়ো উদ্দেশ আছে, তার দাবি কবিকে মেটাতে হয়। গানের জন্য চাই কত সূক্ষ্ম শ্রুতি, তানপুরার তার, কণ্ঠের ব্যঞ্জনা—কবিতায় বক্তব্যের গভীরে নিয়ে যায় ছন্দ, বাক্যের আভাসিত ঝঙ্কার; সমালোচনায় শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তাই সহজ নয়। এই আয়োজন, এই ভাষণ সমস্তের মধ্য

দিয়েই সমালোচনার প্রকাশ, যাকে বলা যায় তার শিল্পব্যবহার। সর্বাঙ্গীণ শিল্প-সৃষ্টিকে যিনি কাব্যের অঙ্গে, আঙ্গিকের যোগে দেখ্‌বার সাহায্য করেন তিনিই সমালোচক। বিশেষ কোনো জ্ঞানবিজ্ঞানের কোঠায় বন্দী ক'রে কাব্যশরীরের অখণ্ড প্রাণময় স্বরূপকে বোঝা যায় না। রূপদৃষ্টি চাই। সমালোচনার কাজ সেই দৃষ্টি জাগানো।

কার্য্যকরী কোনো বিশেষ ব্যবহারকে বিশ্লিষ্ট ক'রে কাজ চলে, কিন্তু প্রাণবান সৃষ্টির সমগ্র ইচ্ছার মধ্যে প্রবেশ করবার ব্যগ্রতা মানুষের। তাতে কাজের চেয়ে অধিক। তারি সন্ধানী না হলে কেউ কাব্য পড়ত না, ছবি দেখ্‌ত না, সমালোচনার দপ্তর শূন্য হ'ত। অর্থতত্ত্ব, পরিবেশধর্ম, পরিভাষা প্রত্যেকের মধ্য দিয়েই কাব্যের ইচ্ছায় প্রবেশ করবার পথ খানিকটা খোলে, আরো অনেক দরজা আছে, কিন্তু সম্বন্ধের মানস নিয়ে এগোতে হয়; প্রাণের বোধ নিয়ে। কাব্যের খণ্ড ব্যবহারকে দরদাঁর মূল্যটুকু দিয়ে শেষে পৌঁছই তার সূক্ষ্ম শিল্পব্যবহারে, তার সত্তায়, যেটি স্বতন্ত্র. সমগ্র, এবং অক্ষিত; হৃদয়ের সংসারে তাকে নিয়ে কারবার। বিচিত্র অভি-জ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে. বিচার ক'রে. পরীক্ষা ক'রে শিল্পের পূর্ণ ব্যবহারটিকে উদ্‌ঘাটিত করতে হলে সেই মূলের সন্ধানী হওয়া চাই। আগন্তুক ভদ্রলোককে বন্ধু-রূপে জানবার সুযোগ হয়, যখন তাঁকে চিনি; অবশ্য তাঁর ব্যবহার পছন্দ না হলে বন্ধুত্ব করব না। কিন্তু আশু বিদায় দিতে হলেও সমালোচক যেন গৃহস্থের ধর্মরক্ষা করেন, নিজের ভদ্রতাকেও অবাঞ্ছিত অতিথির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় না দেওয়া ভালো।

শিল্পী কী-ভাবে তাঁর উপাদানগুলি ব্যবহার করতে পেরেচেন? ব্যবহারের এই আরেকটি প্রশ্ন জাগ্‌বে। তাঁর রচনার একদিকে গড়ন, অন্যদিকে মানস; দু'য়ে মিলে দেখা দেয় শিল্পরূপ। কিছু জ্ঞানে, কিছু অজানিতে, নানা ধাতুর দ্রবধারায় তিনি মূর্তি বানিয়েচেন। নানা ভাবনা, নানা রং, চিন্ময় উপকরণে জমা হয়ে থাকে খনিতে; প্রগাঢ় মুহূর্তের প্রেরণায় শিল্পী তাঁর সঞ্চয়নকে আনেন উপরিতলে—প্রেরণা অর্থে সেই দিব্যাগ্নি যাকে জ্বালাবার জন্যে ব'সে থাক্‌লেই চলে না, কাঠ-খড় এবং কৌশল চাই। আগুন জাল্‌বার পরও আগুনের এবং নানান্‌ ধাতুর ব্যবহার না জান্‌লে কারিগরি হয় না। শিল্পালোচনায় সেই কারিগরির যাচাই হবে; জহুরি শুধু সোনার দাম নয়, মিশ্রণের মনোহারিত্ব যেন বোঝেন। গয়না গড়তে রূপকার বিবিধ নৈপুণ্যের যে-পরিচয় দেন সেইটে আলোচ্য।

শিল্পব্যবহারের এই বিচিত্র শক্তিকে কালিদাস বলেচেন, প্রয়োগবিজ্ঞান। প্রশ্ন

করলেন, পেরেচেন কিনা। আমাদের ভাষায় কবি কালিদাসের ব্যবহৃত সংজ্ঞাটিকে সদৃশার্থে বলতে পারি প্রয়োগশিল্প। যাতে রচনার নির্মিতি এবং রূপমানস দুয়েরই যোগ। সৃষ্টির কাজে দ্রব্যগুণবিচার ও ব্যবহারের দ্বারা আর্টিস্ট্ কীভাবে তাঁর ধারণাকে রূপে সঙ্গত করেন সে-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আজ আমাদের ব্যাপকতর হয়েচে। সৃজনশীল বহুদেশীয় সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে প্রয়োগশিল্পের নানাত্ব আমাদের কাছে স্পষ্টতর প্রতীয়মান হোলো অথচ তার আন্তরিক ঐক্যরহস্যও বৃহত্তর ভূমিকায় দেখা দিয়েচে। নূতন রচনাপ্রণালীর উদ্ভাবনাও থামেনি। সমালোচকের পক্ষে শিল্প-ব্যবহারের বিচাব অনেকটা সূক্ষ্মতর দায়িত্বে পরিণত হয়েচে সন্দেহ নেই।

৩

প্রয়োগ

প্রয়োগব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের একটি বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা দিয়েচে; সাহিত্যেও তাই নিয়ে তর্ক উঠ্‌ল—সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। আমাদের যুগ প্রধানপক্ষে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের, যদিও অপব্যবহারের অন্ত নেই। লক্ষ কলের এবং কর্মবিধির যোগে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপযোগিতা আমরা পরীক্ষা করচি। যা মানসী প্রত্যক্ষ তাকে ঘটনার তর্জমা না ক'রে আমাদের তৃপ্তি নেই। তার কারণ আমরা জানি যা শুভ তার যাথার্থ্য নির্ণীত হয় জীবনের প্রাত্যাহিকে; উৎকর্ষের মূল্যকে সংসারে না ফলিয়ে কল্যাণের ব্যাখ্যা নিরর্থক। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ তত্ত্ববিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে জ্ঞানেব মূল শুকিয়ে যায়, সেটা আত্মঘাতিক, কিন্তু ধ্বংসের অন্য উপায় সেই বিশুদ্ধিতায় ডুবে মরা। অশুদ্ধ সমাজের সংস্করণে বিদ্যাকে ডাঙায় তুলে আনতে হয়; কল্যাণবিদ্যা উভচরী। চোখের সাম্‌নে দেখচি গণিতশাস্ত্রজ্ঞ অঙ্ক কষ্‌চেন, অন্যদিকে অগণিত মানুষ বেহিসাবী সংসারে মরচে—এর মধ্যে যোগ কোথায়? বাঁচবার প্রত্যেক বিভাগে আঙ্কিক সত্য চাই, কিন্তু তাব জন্য গণনা-শক্তিকে প্রাণের কাজে লাগানো দরকার। সভ্যতা অর্থে হিসাবের মিল, আদর্শিক মূলধনে এবং বাস্তব খরচে একান্ত গরমিল হলে কোনো মহাজন বা মহাজাতি রক্ষা পায় না। মধ্য দিয়ে ব'হে যায় কান্নার জল, সংসার হয় পঙ্কিল, যুগের ঐশ্বর্য যায় ভেসে। দুই বাস্তবকে মানি ব'লেই ধ্যানবস্তু এবং প্রাণবস্তুর মধ্যে জমিটাকে দৃঢ় করতে চাই। যুগের চেতনায় আজ অপ্রযুক্ত সত্যের দাবি অসহ হয়ে উঠল; তার এক কারণ, প্রয়োগ সত্যের সাফল্য আমরা চক্ষে দেখেচি ভোগ না করলেও, মানবিক অনুভূতিও আমাদের বেশি। পৃথিবী জোড়া মারীব্যবসায়ের দিনেও এই

কথা বল্‌ব। এমন অবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে এবং সর্বত্র প্রয়োগমূল্য, অর্থাৎ ব্যবহারিক উৎকর্ষের দাবি একান্ত হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য কী।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের প্রশ্নটা সহজতর। কেননা, অভিজ্ঞতাকে ভাষায় ফলানোর কাজই হোলো সাহিত্যের। অভিজ্ঞতার কোনো স্তব, কোনো বার্তাকে ঠেকিয়ে রাখা সাহিত্যের অসাধ্য। সাহিত্যই প্রকাশ। প্রাণপ্রাচুর্যের এবং পরিণতির সন্ধান দেয় সাহিত্য; যে-ভাবেই দিক্‌ না কেন। কখনো স্বপ্ন দেখিয়ে, নয় স্বপ্ন ভাঙিয়ে। মানুষকে ডাক দেবার জন্যে শিল্পে কত সুর, কত কাছের ডাক, কত দূরের কাম্য, উপায়ের অন্ত নেই। কিন্তু লক্ষ্য একই: মানুষকে অস্তিত্বের সন্ধান দেওয়া। তার স্বত্বকে প্রকাশ করা। সাহিত্যের বড়ো সৃষ্টি হলো বড়োরকমের দৃষ্টি —সংসারকে দেখানো হচ্চে। সেই দৃষ্টিতে আমাদের চোখ খুলে যায়, যাই দেখিনা কেন জীবনকে বিস্তৃত দেখি। শিল্পীর দর্শন আমাদের সঙ্গে না মিল্‌লেও, তিনি নিজেকে নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রদর্শন করচেন—তাতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বেই। মূল্যকে প্রযুক্ত না ক'রে সাহিত্যের উপায় নেই, সাহিত্যই প্রয়োগ। ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবের প্রয়োগ, নানান্‌ অভিজ্ঞতার সংযুক্ত প্রয়োগ কল্পনা-সৃষ্টিতে, ছন্দোময় একযোগিতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন উপলব্ধ সত্যের নিশ্চয়-বোধকে প্রযুক্ত করা সম্বন্ধে উদ্বেগের যথার্থ কোনো কারণ নেই, কেননা সর্বমানবিক সত্যের প্রয়োগসাধনায় কোনো সত্যকেই বাদ দেওয়া চলে না। সাহিত্যের দিক থেকে কোনো বাধাই নেই।

বাধা আছে সাহিত্যের দেউড়িতে। শিল্পীর সমাজ হয়তো দরোয়ান বসিয়ে মোটরে-আসা দর্শক ব্যতীত অন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, শিল্পী নিজেও ব্যক্তিগত বাধা দিতে পারেন। কিন্তু শিল্পপ্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ অবারিত, সর্বযুগের সর্বলোকের কাছে। প্রতিবিধান করার কাজটা শিল্প সমালোচনার বহিরঙ্গে করতে হয়। সৃষ্টি-শিল্পের কাছে সমালোচক একটা মাত্র দাবি আন্‌বেন, প্রকাশ করো। প্রকাশ চলতে থাক্‌। কী প্রকাশ হবে তার দাবি শিল্পের কাছে নয়, শিল্পীর কাছে। সমাজের কাছে। অর্থাৎ সামাজিক মানুষরূপে শিল্পীকে বল্‌তে হবে মানুষের অভিজ্ঞতা তোমার যথার্থ হোক্‌, সত্য কথা বোলো। তুমি বদ্‌লাও। কবিকে বদ্‌লাতে পারলে কবিতা বদ্‌লাবে, কিন্তু, আর্টের রাজ্যে বিশেষ ফরমাস খাটবে না। কেননা তার কাজ সৃজিত হয়ে ওঠা। কবিতার ভালোমন্দ বিচারে প্রকাশ-শক্তির ভালো মন্দকে মূল্য দেওয়া চাই। যত বড়ো তত্ত্বকথাই ঘোষিত হোক্‌ না সনেটের চৌদ্দ লাইন, মিল, এবং ভাষা অচল হলে বল্‌ব ভালো সনেট হয় নি,

কবিতায় যৌগিক অভাবই ঘটেচে। রাষ্ট্রতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্রের খাঁটি প্রয়োগ বিচার হবে খাঁটি প্রকাশের দ্বারা। শিল্পের প্রাণশক্তির পরিচয়েই তার যথার্থ পরিচয়, তার বক্তব্যেরও পরিচয়।

সাহিত্য স্বভাবতই সাম্যধর্মী, আধিকারীভেদ ঘোচানো তার লক্ষ্য—হোক্ দলের, ধর্মের, বা প্রভুপন্থীর—মানুষের অধিকারকে সে ব্যক্ত না করে পারবে না। সত্য বিকৃত হয়ে সাহিত্যে প্রকাশ পেলে সেই বিকৃতিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাতে ক্ষতি হবার কথা নয়। চেনা যায়। অন্যান্য প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ রইল। কোনো প্রকাশকে বন্ধ করা, যদি তা যথার্থ সাহিত্যপর্যায়ী হয়, সাহিত্যের রীতিবিরুদ্ধ। সত্যের বৃহৎ ভূমিকায় বিশেষ শিল্পকাজকে দেখানো সমালোচকের কাজ, আক্রমণের পুলিশবৃত্তি নয়। মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার দায়ে ডিক্টেটরি সমাজকে মার্কা-মারা সাহিত্য বানাতে হয়েচে, এর প্রতিকার করতে গিয়ে আমরাও যেন স্বদলের মার্কা-মারা সাহিত্য না চেয়ে বসি। তার কোনোটাই সাহিত্য হবে না। আমরা দাবী করব: সব কথা বলো। তাতেই আসল কথা বলা হবে। জোর করতে গেলে নকল কথা বেরোয়।

ব্যবহারবিচারের আরো একটি পর্ব আছে। কীট্‌স্ গ্রীসীয় মৃৎ-পাত্রটিকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেচেন এক ভাবে; আমরা তাঁর কবিতার পাত্রটিকে কী ভাবে সামাজিক ব্যবহার করব যাতে আমাদের সমাজধর্ম প্রকাশ পাবে। সাহিত্যের সংলগ্ন হলেও তাব অন্তর্গত সমালোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। পুরোনো রূপকথা এবং মন্তব্যের যোগে প্রাচীন কুসংস্কারকে বধ করা চলে; পটে-চিত্রিত শুভ্র মর্মব প্রাসাদের দিকে কটাক্ষ ক'রে বলা যায় এরি দিকে চিত্রীর পক্ষপাত কেন। হয়তো ম্যালেরিয়ার মশাতাড়ানোব সৎকাজে সাহানার রৌদ্ররাগিণী বাজিয়ে কর্মীদলকে দশ পা দ্রুত চালানো যাবে—কিন্তু শিল্পকে নিয়ে ব্যবহার-শাস্ত্রেব এই অধ্যায়টি সমালোচক অন্যত্র পাঠ করুন। প্রধান কথাটা তিনি যেন সামাজিক উৎসাহে না ভোলেন।

কাব্যের পাত্রে আর যাই থাকুক্, খানিকটা উজ্জ্বল চৈতন্যের রস রাখা থাকে; আশ্চর্য্য এই-যে রসটুকু ফুরোয় না। আর পাত্রটি কী সুন্দর। সেই নিঃসৃত মাধুরী পান করলে নেশা জমে, যাকে আনন্দ বলা হয়; যা আচ্ছন্ন করে না, দহন করে না, প্রাণ বাড়ায়। প্রাণের অধিকার সর্ব প্রাণীর; সেই প্রাণ পরিবেশিত হোক্ অবারিত সাহিত্যের আসরে। যদি আজ এতদিনে নূতন মনুষ্যত্বের দাবি—যেটা মুখ্যত এসেচে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে—সাহিত্যের পেয়ালায় প্রাণরস সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার আয়োজন করে তাহলে সেই জীবনীধারা উপভোগ ক'রে

একটি নূতন বোধন জীবনের মূলে সঞ্চারিত হবে। শিল্পের অনুপ্রেরণা, যা প্রজ্ঞানঘন সনাতন, সনাতনীর বন্ধনমুক্ত হলে নবীন দুঃসাধ্য শিল্পসৃষ্টির পথ খুলে যায়; আজ সেই পথ খুলে যাচ্চে। কিন্তু সাহিত্যে এই একটি তেজস্ক্রিয় নবীনতা দেখা দিল তার কারণ সমাজের নানা মানুষ এখন সাহিত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠস্বরূপ ভোগ করতে পারচে। পরিবেশনের শুভবিধানকে এর প্রকৃত কারণ বল্‌লে সাহিত্যের দিক থেকে ঠিক জায়গায় মূল্য দেওয়া হয় না।

যুগবর্তী না যুগবতী?

শ্রীযুক্ত কবিতা সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন.

বিশ্বভারতী কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়ের একটি প্রবন্ধের একটি বাক্যের (পৃ. ১২) একটি শব্দের 'কবিতা'য় প্রকাশিত পাঠ পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনি যে 'আপত্তি' করেছেন সে-সম্বন্ধে প্রকাশকের বক্তব্য জানাতে সুযোগ দিয়েছেন ব'লে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আপনি এই সমালোচনায় ব্যাকরণকে যেরূপ পরিহাস করেছেন তারপর আর ব্যাকরণের কথা তুলতে রীতিমত ভয় হয়।

"তিনি [রবীন্দ্রনাথ] তো সেই শ্রেণীর লেখক ছিলেন না যাঁরা অতিকষ্টে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে চ'লে..." ইত্যাদি।

এটি যুক্তি নয়, special pleading মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ "নীরস" "শুদ্ধবোধ"ওয়ালাদের সঙ্গে সারাজীবন অনেক তর্ক করেছেন কিন্তু সম্ভবত "আমার এই ভালো লাগে" গোছের যুক্তি তর্কক্ষেত্রে দেন নি. প্রত্যেক বারই উত্তরে যুক্তি দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, বাংলার ব্যাকরণের নিয়ম স্বতন্ত্র, তার নিয়ম বেঁধে দিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু ব্যাকরণকে উড়িয়ে দিয়েছেন বলে জানি না। সংস্কৃত শব্দে তিনি নূতন অর্থ, নবদ্যোতনা অবতার করেছেন. কিন্তু দু একটি common error ছাড়া ক'টি শব্দের এমন প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাকরণ-সংগত নয়? সংস্কৃত প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ ক'টি করেছেন?

"সরসতার কাছে......সসম্ভ্রমে দৌড় দেবে ব্যাকরণ।"

"এই স্ত্রীরূপ [যুগবতী] ব্যবহারে পরিহাস ফুটে উঠেছে।"

মর্মান্তিক পরিহাস কি সমস্ত রচনাটির অধিকাংশ ছত্রেই ছড়িয়ে নেই? যুগবতী শব্দ

ব্যবহারের উপরেই কি সেই পরিহাসের ও সরসতার চরম ও একান্ত নির্ভর? পরিহাস যাঁদের বুকে বিঁধবার বিঁধেছে, যুগবতীর সাহায্য দরকার হয় নি।

"হাতের লেখা পড়তে আমার ভুল হয়েছে, কিংবা তিনিই ভ্রমক্রমে যুগবর্তীকে যুগবতী লিখেছেন এ-রকম তর্ক উঠতে পারত।"

সম্ভবত আপনি এগুলিকে কুতর্ক মনে করেন। আপনি ভুল পড়ে থাকতে পারেন কি না জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিহ্ন যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন বা অতিরিক্ত চিহ্ন যোগ করেছেন, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এ-রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে; বিশেষত রেফ যোগ বিয়োগের বেলায়।

"যুগবতী ব্যাকরণসঙ্গত নয় সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।"

ব্যাকরণ যখন taboo, এবং ব্যাকরণসঙ্গত কি নয় সে প্রমাণের উপর যখন আপনার বিশ্বাস নির্ভর করে না, সুতরাং "ব্যাকরণের দোহাই" পাড়বার আবশ্যকতা নেই। সংস্কৃত প্রত্যয়ের ব্যবহার যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এক্ষেত্রে ব্যাকরণের দোহাই বাহুল্যমাত্র, অন্যদের বোঝানো "দুঃসাধ্য"। তার পরে "আভ্যন্তরীণ প্রমাণ":

"মিডভিক্টোরীয় যুগবতী মানে mid-Victorian"।

সংকলয়িতার মনে মিডভিক্টোরীয় যুগবর্তী মানেই mid Victorian, এবং শুধু মিড-ভিক্টোরীয় মানেও তাই।

"গোরুর বিশেষণ বলে স্ত্রীলিঙ্গ, এ তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।" একটি কথা শুধু অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে।

'গোরু' কি স্ত্রীলিঙ্গ? অজ্ঞতা মার্জনীয়। যখন কোনো পুরুষ বন্ধুকে প্রাকৃত-জনোচিত ভাষায় বলি "তুই একটা গোরু" তখন নিশ্চয়ই শুধু প্রাণীতত্ত্বের ভুলই করি না, ব্যাকরণের ভুলও করি?

আলোচ্য গোরুটি (সমালোচনার উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য) "গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা"। গাড়িতে যে গোরু জোড়া হয় তার বিশেষণে "স্ত্রীরূপ ব্যবহার" আবশ্যক হয় ব'লে আমাদের জানা ছিল না; আমাদের ধারণা ছিল গাড়ি বলদেই টানে, এবং "রস" বা রসিকতা কোনো কারণেই তার বিশেষণে স্ত্রীরূপ ব্যবহার আবশ্যক হয় না। তবে "জোর ক'রে তর্ক" করব না।

বিনীত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

৭. পত্রখণ্ড

তর্কের দ্বারা অসম্মান দূর হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, করে স্নান করিনে, মানুষেব স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি ; তর্করত্ন মশায়ের কোলে যদি বিড়াল এসে বসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন না, মেথরের ছেলে তাঁকে স্পর্শ করলে তিনি অশুচি হন। মেথরের বৃত্তিতে যে মলিনতা সে মলিনতা আমাদের দেহের মধ্যে। মা কবেছেন মেথরের কাজ, তার দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। পঙ্কের মধ্যে নেমে'মেছুনি মাছ ধরে ব'লে সে সকল অবস্থাতেই পঙ্কিল এমন কথাব অর্থ নেই। পঙ্ক ধৌত করে যখনি সে নির্ম্মল হয় তখনি অন্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। যাকে আমরা হীনবৃত্তি বলি, সে আমাদেরি প্রয়োজনে ; অন্তত ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই সেই কাজ করা উচিত ছিল। যাবা আমাদের হয়ে ক'রে দেয় তাদের ঘৃণা করার মতো ঘৃণ্যতা আব কিছুই নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ যে সব দুষ্কৃতি ক'রে থাকে তাদেব চবিত্র তাব দ্বারা কলুষিত হলেও তারা ধনী ও পদস্থ হয় তবে তাদের সঙ্গ আমরা প্রার্থনা করি। দেহের কলুষ জলেই ধুয়ে যায়, মনের কলুষ গঙ্গাস্নানে যায় ব'লে মনে কবা মূঢ়তা,—কিন্তু সেই কলুষিত স্পর্শ তো আমাদেব চারদিকেই। মেথরের চেয়ে দেহে মনে মলিন, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণ'ক সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত, তাবা কি মন্দিরের পূজাবী শ্রেণীতেও নেই ? ব্রাহ্মণ হোক্ মেথর হোক্, কলুষিতকে ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু কোনো জাতকে ঘৃণা করবাব স্পর্দ্ধা দেবতা ক্ষমা কবেন না—ভারতবর্ষকেও তিনি ক্ষমা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমালোচনা

নূতনা রাধা। অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি। দুই টাকা।

কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করবার সৌভাগ্য বাঙালি কবির প্রায়ই হয় না ; প্রৌঢ়ত্বে কিংবা মৃত্যুর পবে প্রকাশিত একটি কাব্য-সঞ্চয়নই তাঁদের জীবনব্যাপী কবিকর্মের নিদর্শন হ'য়ে থাকে। কাব্যসঞ্চয়ন-প্রকাশের প্রথাও আমাদেব দেশে অল্পদিনের ; দেবেন্দ্রনাথ সেন বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের ওরকম কোনো সঞ্চয়নগ্রন্থ নেই, তাঁদের বইগুলিও সম্পূর্ণ লুপ্ত, ফলে আধুনিক পাঠকের তাঁদের সঙ্গে কোনো পরিচয় হবারই সম্ভাবনা নেই। সত্যেন্দ্র দত্তের কোনো-কোনো বইও অনেকদিন হ'লো বাজারে

নেই, কেন তাদের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না জানি না। দোকানের শেল্‌ফ্‌ থেকে বসুমতী, বসুমতী থেকে ফুটপাথ, এবং ফুটপাথ থেকে অবলুপ্তি—এই তো বাঙালি লেখকের সাধারণ ভাগ্য, তার উপর কবিভাগ্য বিশেষরূপে শোচনীয়, কারণ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ব্যবসার দিক থেকে লোভনীয় নয়। আমাদের বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় কবিদের সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করবার সংবুদ্ধি কি কোনোদিন কোনো প্রকাশকের হবে না?

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ভবিষ্যতের কিংবা অদৃষ্টের উপর ভরসা রাখেননি, তিনি প্রাক্‌-চল্লিশেই নিজের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এ-ধরনের উদ্যম তাঁরই প্রথম। অবশ্য সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ হ'লেও বইটির আকার বেশি বড়ো নয়, মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠা। 'কাগজের দাম বুঝে অনেক কবিতা' তিনি গ্রহণ করেননি সম্প্রতি প্রকাশিত 'উড়কি ধানের মুড়কি' ও 'পরবর্তী কালের' ব'লে এ-বই থেকে বাদ গেছে। তাহ'লেও এটা বোঝা যায় যে তাঁর কবিতার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কবিতাগুলি বারো বছর ধ'রে লেখা, এবং 'নূতনা রাধা' তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যলেখক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। একটি স্বচ্ছ উজ্জ্বল মনোহর গদ্যরীতির তিনি অধিকারী। তাঁর গদ্যরচনায় সেই জাদু আছে যার প্রভাবে বক্তব্য বিষয়ে আমূল মতবিরোধ হ'লেও শিল্পকর্ম হিসেবে সেটি উপভোগ করতে বাধে না। এমন খুব কম গদ্যরচনাই তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে যা উপভোগ্য নয়। প্রথম জীবনে তিনি গদ্য-পদ্য সমানে লিখছিলেন, পরে গদ্যের দিকেই বিশেষ ক'রে ঝুঁকেছেন। সেইজন্যেই তাঁর কবিতার পরিমাণস্বল্পতা। 'নূতনা রাধা' প'ড়ে এ-কথাই মনে হয় যে তার কবিত্বশক্তি গদ্য-সতীনের প্রসারের চাপে তাঁর জীবনগৃহের একটুখানি জায়গা মাত্র জুড়ে আছে, তার মূর্তিটি কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নববধূর, দীপ্তিময়ী ঐশ্বর্যশালিনী জীবনসঙ্গিনীর নয়।

'প্রথম স্বাক্ষর' ও 'রাখী' 'নূতনা রাধা'র প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ। এই কবিতাগুলি ভাববিলাসী নবযৌবনের সহজ আবেগ থেকে উৎসারিত, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রথম অপূর্ব সচেতনতার আনন্দে কবি এ-জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে উপভোগ করবেন, এই কথাটি নানা ছন্দে, নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কথাটি নতুন নয়, প্রায় সকল তরুণ কবিরই এই কথা, কিন্তু এই ভাবটি প্রায় একই সময়ে লেখা 'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর যেমন সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেছিলেন, কবিতায় ঠিক সে-রকম হয়নি। রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট, তাছাড়া প্রায় আগাগোড়াই রবীন্দ্র-

ছায়াচ্ছন্ন। এরই মধ্যে 'রাখী'র উৎসর্গের চারটি লাইনে কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, এই ক্ষুদ্র স্তবক প'ড়েই বোঝা যায় যে যদিও এখনো তাঁর বাণী কুণ্ঠিত, এই কবি যথার্থ শক্তিশালী।

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমায় আমায় মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

তৃতীয় গ্রন্থ 'একটি বসন্ত' থেকে পরিণতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম যৌবনের অস্পষ্ট আবেগ-নীহারিকার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা দিয়েছে সুগঠিত জ্যোতিষ্ক-দল। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত 'নূতনা রাধা'য় প্রেমের ও প্রকৃতির অনুভূতি বিচিত্র ভঙ্গিতে লীলায়িত। এই পাতাগুলির মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা পাওয়া যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—'পূর্ণিমা'।

আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে
আমার মন আছে ভালো।
আকাশ হ'তে খালি কুসুম ঝরে
মাটির ফুলদানি ফাটিয়া পড়ে
ধরায় ধরে না যে আলো।

আমার পূর্ণিমা আমার পাশে
হৃদয়ে কোনো খেদ নাই।
আমার জামাখান বুনিছে তা সে
কদাচ মুখ তুলে মুচুকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।

'জামাখান' ও 'তা সে' এ দুটি কথা দাঁতে কাঁকরের মতো হ'লেও কবিতাটি যে ভালো তাতে সন্দেহ নাই।

আমার নিজের সবচেয়ে ভালো লাগলো 'জার্নাল' অংশ। এই ছোটো-ছোটো টুকরো কবিতাগুলোয় কবির প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ যেন উপচে পড়ছে—অথচ আতিশয্য কোথাও নেই, সবটুকুই স্নিগ্ধ ও কমনীয়।

জীবন কী বিমোহন রে জ্যোৎস্নাবিকীরিত রাত্রে
সমীর শীকর যায় বরষি' তরণী দুলিছে জলগাত্রে।

ভুবনে তাহার কিবা ভাবনা প্রণয়প্রতিমা যার অঙ্কে
কণ্ঠে যাহার সুরমদিরা তাহারে কাঁপাবে কী আতঙ্কে !

মনের এই কথাটুকু—শুধু নিজের নয়, পাঁচজনের মনের মতো ক'রে বলতে পারা যে শক্তিসাপেক্ষ, শুধু তাই নয়, ভাগ্যের বিশেষ অনুকম্পা হ'লেই যে তা বলা যায় এ-কথা আর কেউ না জানুক আমরা কবিরা জানি। এ-সব জিনিস ভারি ওজনের নয় ব'লে সাধারণ পাঠক অবজ্ঞা করতে পারেন কিন্তু কবিদের কাছে এর চিরকালের আদর।

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এটি প্রকৃতিবর্ণনার :

শুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহারি সঙ্গে মেশা
রথ তুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকার চকমকি ঠোকে ফুল্‌কি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক্‌ বলে দেয় ধরায়।

এ-রকম নিটোল উজ্জ্বল রত্নকণিকা 'জার্নালে' আরো আছে।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'ক্রীডো' কবিতায় বলেছেন—'মনেব কথা মনের মতো ক'রে কইবো আমার মনের মতনকে, কবি হবার নেই দুরাশা ওরে সার মেনেছি সত্য-কথনকে।' 'নূতনা রাধা' তাঁর এই ক্রীডকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। 'Ambitious' বলা যেতে পারে এমন একটি কবিতাও এতে পাওয়া যাবে না, তাঁর সাহিত্যিক উচ্চাভিলাষের ক্ষেত্র গদ্য, পদ্য তাঁর শখ। অথচ 'নূতনা রাধা' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে অন্নদাশঙ্কর একজন সত্যিকার কবি। উইলিয়ম মরিসের মতো ইনি একজন happy poet, এবং সকলেই জানেন যে সুখী কবি বিরল। কবি হ'য়েও ইনি কোনো দুঃখের গান করেননি, না ব্যক্তিগত না বিশ্বমানবিক দুঃখের। দুঃখের গানই আমাদের মধুরতম গান কিনা জানি না, কিন্তু এই কবিতাগুলি যে মধুর তা মানতেই হয়। অন্নদাশঙ্করের বিশেষত্ব তাঁর ভাষার লাবণ্য, তাঁর ভঙ্গির কমনীয়তা, তাঁর আনন্দিত কৌতুকোজ্জ্বল বিশ্ব-দৃষ্টি। শুধু প্রিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর প্রেমেই তিনি পাগল, আপন সুখ-নীড় ও বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি এত সুখী যে সেই সুখ কবিতায় প্রকাশ না-ক'রে তাঁর মন শান্ত হ'তে পারে না। তাঁর রচনায় wit-এর দ্যুতি থেকে-থেকে ঝলক দিচ্ছে, কখনো বা conceit-এর চমক লাগে, প্রায়ই তিনি সতেরো শতকের রাজভক্ত ইংরেজ কবিদের কথা মনে করিয়ে দেন,

এ-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে তাঁর মিল আছে যথার্থ light verse আধুনিক বাংলায় যাঁরা লিখতে পেরেছেন তাঁরা হলেন অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে ও অজিত দত্ত—কেউ-কেউ হয়তো অমিয় চক্রবর্তীর কোনো-কোনো রচনাও এই শ্রেণীতে ফেলতে চাইবেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে light verse light হ'লেও slight নয়, এবং কবিত্বের সঙ্গে wit-এর বিবাহ ঘটাতে খুব পাকা পুরোহিত প্রয়োজন। এই পৌরোহিত্যের সকল গুণই অন্নদাশঙ্করের আছে, এই কারণে বাংলা কাব্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান। আমাদের আক্ষেপ শুধু এই যে তিনি আরো বেশি লেখেন না। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠককেই আনন্দ দিয়েছে, হালকা কবিতার ক্ষেত্র তিনি যেন আরো নিবিড়ভাবে কর্ষণ করেন এই আমাদের অনুরোধ। তাঁর কবিত্ব-বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীক্ষা আমরা সাগ্রহে করবো।

বুদ্ধদেব বসু